বাঙ্গালাপ

নটরাজন ——→

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BANHILIPI

A BENGALI NOVEL

By

NATARAJAN

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
সুধীর দাসগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৮

অনুজপ্রতিম

শ্রীপ্রবীর মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু—

ঘরের সৌন্দর্য যদি ঘরণী, তাহলে মার্চেন্ট অফিসের সৌন্দর্য সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। বাইরের লোকের পক্ষে অফিসে ঢুকে প্রথমেই মুখোমুখি হতে হয় এই মহিলাটির। এর চাল-চলন, আদব-কায়দা, কথাবার্তার ওপরই নির্ভর করে অফিস সম্পর্কে প্রাথমিক ইম্প্রেশন। তাই এযুগে চৌকস রিসেপশনিস্টের আদর ও কদর দুই-ই যথেষ্ট সাহেব গেলে সাহেব আসে, কিন্তু একজন সত্যিকারের তুখোড় রিসেপশনিস্টের খালি পদ পূরণ করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য তো বটেই। তার ওপর একালের ভারতীয়করণের যুগে সওদাগরী অফিসে স্কার্টের হ্রস্বত্ব ও বব-কাট চুলের সৌন্দর্যের চাইতে শাড়ির বাহার ও ঘাড়ের ওপর ভেঙেপড়া খোঁপার আকর্ষণই বেশি—এমনকি গায়ের রং একটু চাপা হলেও। বিদেশের বাঘা বাঘা ঝানু ব্যবসাদার সাহেব-সুবোরাও এদেশে এসে ঐ শাড়ি-খোঁপার দিকে তাকিয়ে চোখের একঘেয়েমি কাটিয়ে নেয়। ব্যবসা সংক্রান্ত নিরস কথাবার্তার মরুতে এই মহিলারাই যেন একমাত্র ওয়েসিস।

সেই বিচারে কলকাতার এই বিখ্যাত মার্চেন্ট ফার্মের রিসেপশনিস্ট সবিতা ঘোষ বাস্তবিকই এই অফিসের গর্ব। দেখতেও যেমন অপূর্ব সুন্দরী, কথাবার্তা, চালচলনেও তেমান কেতা-দুরস্ত। কিন্তু তাই বলে প্রগল্‌ভ তো নয়ই, একটা সুমধুর স্নিগ্ধতা যেন সর্বদাই ঘিরে রেখেছে তাকে যার পরিচয় তার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললেই টের পাওয়া যায়। সবিতার কেতা-দুরস্ত চালচলনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তেই ফুটে ওঠে এমন এক আন্তরিকতার স্পর্শ যা নাকি এযুগে তেমন সুলভ নয়। আবার, সেই স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশে থাকে এমন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধের আবরণ যা ভেদ করে তার খুব কাছাকাছি যাওয়া একান্তই কঠিন। সুন্দরীর গালে বিউটি স্পটের মত এই আবরণটুকুই সম্ভবতঃ তার চরিত্রের সৌন্দর্য যা নাকি তার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে।

ইংরেজি মিডিয়ামে লেখাপড়া শেখা চব্বিশ বছরের যুবতী সবিতার কাছে যাওয়া যতটা সহজ, তাকে কাছে পাওয়া ঠিক ততটাই কঠিন। কিন্তু তাই বলে সেই চেষ্টা যে কেউ করেনি কিম্বা এখনও করছে না তা' নয়। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, খোদ অফিসের যুবককুলের কাছেও সবিতা সর্বদাই আলোচনার পাত্রী। স্টোর-কীপার অমল বাগচীকে ঠিক প্রৌঢ় বলা না চললেও যুবক বলা চলে না। সেই বাগচী মশাই প্রতিদিন টিফিনের সময় সবিতার ঘরে এসে তার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে যায়। এটা

প্রায় রুটিনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অফিসের অন্য কর্মীরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, কেউ কেউ মাঝে মধ্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না, কিন্তু বাগচীমশাই নির্বিকার। রুটিনের একচুল এদিক-ওদিক হয় না তার। বেশি বিরক্তিবোধ করলে সদ্য জ্বালানো সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অফিসের ছেলে-ছোকরাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আমার মেয়ের বয়সী, তাই মাঝে মধ্যে একটু খবর-টবর নিই। এতে তোদের এত চোখ টাটায় কেন? তোদের বাড়াভাতে তো আর ছাই ঢালতে যাচ্ছি না। এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অরুণ রায় নিজেকে অফিসের সেরা সুপুরুষ বলে মনে করে। চেহারাটা যদিও খারাপ নয়, কিন্তু সে নিজেকে যতটা মনে করে ততটাও নয়। বিখ্যাত মার্চেন্ট অফিসের এ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী, মাইনেপত্র ভালোই পায়। বিয়েথা করেনি এখনও। কাজেই প্রতিদিন পাটভাঙা প্যান্ট-জামা পরার মত সঙ্গতি তার যথেষ্টই আছে। সেই অরুণ রায়ও সুযোগ পেলে প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশি সময়ই সবিতার ঘরে বসে থাকতে পছন্দ করে। বন্ধুদের ঠাট্টার জবাবে নিজের ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা ফাঁপানো চুলের বোঝার ওপর একবার আলতো হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, আরে রেখে দে তোদের সবিতা! আমি যেখানে যাতায়াত করি সেখানে গণ্ডা গণ্ডা এর চাইতে ঢের বেশি সুন্দরী পাওয়া যায়, বুঝলি? তেমন ইচ্ছে থাকলে তাদের কাউকে নিয়েই এতদিন ঝুলে পড়তাম। আসলে এসব আমার ধাতে একেবারেই সয় না। অরুণের কথায় বন্ধুরা আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। হয়ত্যে তারা মনে মনে বলে—আঙুর ফল টক। তবে ইদানীং অরুণ রায় যে টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় যাতায়াত শুরু করেছে এ খবর তারা অরুণের মুখেই শুনেছে। শুধু কি তাই নামী-দামী সিনেমা স্টারেরা নাকি অরুণকে পর্দায় নামানোর ব্যাপারে প্রায়ই পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু অরুণ রাজি নয়। অনেক পীড়াপীড়ির পরে অরুণ রায় নাকি একবার বাস্তবিকই সিনেমায় নেমেছিল। কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। তার বন্ধুরাও সেই ছবি দেখেছে। রূপোলী পর্দায় জনতার মধ্যে একবারমাত্র দেখা গিয়েছিল তাকে।

একদিন অফিসের একটা ফাইল নিয়ে সবিতা নিজেই এসেছিল অরুণের টেবিলের কাছে। সবিতা সাধারণতঃ নিজে কারুর কাছে যায় না। সহকর্মীদের সঙ্গে ফাইল চালাচালি করে বেয়ারাদের মাধ্যমেই। কেবলমাত্র অফিসের বয়সের চাইতে রাশভারি চেহারার ছোট সাহেব সজল মিত্রের চেম্বারেই মাঝে মধ্যে যেতে হয় তাকে। ছোটসাহেবের কড়া হুকুম, বেয়ারা মারফত কাগজপত্র না পাঠিয়ে নিজে এসে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হবে।

সেদিন সবিতাকে ফাইল হাতে অরুণের কাছে আসতে দেখে অনেকেই একটু চমকে উঠেছিল। বিশেষ করে অফিসের মহিলা কর্মচারী মহলেই সেই চমকটা

ছিল কিছু বেশি। তাদের মধ্যে কেউই সবিতাকে তেমন একটা সুনজরে দেখতো না। সবিতা কারুর সঙ্গে মেশে না, ক্যান্টিনে বসে তাদের সঙ্গে গল্প করে না, শীতের দিনে উলের ডিজাইন কিম্বা টেস্ট-ক্রিকেট নিয়ে আলোচনাও করে না কেউ গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে একটু মিষ্টি হেসে কেবলমাত্র জবাবটুকু দিয়েই চুপ করে থাকে। কাজেই, সবিতা যে তাদের সম্পর্কে বেশ একটু উন্নাসিক এবং সেই উন্নাসিকতার একমাত্র কারণ যে তার রূপ এটা জলের মতই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে। অফিসের মেয়েদের এ ধরনের মনোভাবের কথা বুঝতে না পারার মত বোকা নয় সবিতা, কিন্তু সে নিরুপায়। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা কিম্বা মাখামাখিকে কোনকালেই পছন্দ করে না সে।

নিজের টেবিলের সামনে সবিতার সেই উপস্থিতিকে নিজের প্রতি সবিতার বিশেষ একটু করুণার ইঙ্গিত বলেই মনে করে অরুণ রায়। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেও সেই ভাবটুকু চেপে মুখের ওপর এমন একটা নির্বিকার ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে যেন এসব সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সেই মুহূর্তে অরুণ অনুভব করে অফিসের বড় হল ঘরের অনেকজোড়া চোখ তাদের দিকে নিবন্ধ। সবিতাকে একটু খুশি করা ও নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করা, এই দুই পাখিকে একঢিলে মারতে গিয়ে মুখে সামান্য হাসির রেখা ফুটিয়ে অরুণ বলে ওঠে, আপনি নিজে আবার কষ্ট করে এলেন কেন, মিস্ ঘোষ, বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।

—না অরুণবাবু, জবাব দেয় সবিতা, ছোট সাহেব বললেন নিজে এসে আপনাকে ভাউচারের এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে।

—ও, তাই নাকি? একটু যেন আশাহত হয় অরুণ। সবিতা তা'হলে নিজের ইচ্ছেয় আসে নি। এসেছে কেবল ছোট সাহেবের হুকুমে।

আধমিনিটে যেটা বোধগম্য হয় সেটা সবিতার কাছ থেকে বুঝে নিতে পাক্কা পাঁচ মিনিট সময় নেয় অরুণ। অবশেষে যখন সে বুঝতে পারলে আর না বোঝার ভান করাটা বাস্তবিকই দৃষ্টিকটু তখন সবিতাকে তখনকার মত বিদায় দিয়ে বললে, বুঝলেন মিস ঘোষ, ব্যাপারটা স্টিল্ কেমন যেন একটু গোলমেলে থেকে গেল। আপনি নিজের ঘরে যান, আমি একটু পরে ব্যাপারটা বুঝে নিতে আপনার ঘরে যাচ্ছি।

অরুণের এই না বোঝার ভানটুকু সবিতার পক্ষে ধরে ফেলতে বেশি সময় লাগে না। এমন কিছু কম্প্লিকেটেড ব্যাপার নয়, অথচ অরুণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না অথবা বুঝতে চাইছে না। কথাটা মনে হতেই একটু কৌতুক বোধ করে সবিতা। ফাইল বন্ধ করে সেটা অরুণের দিকে ঠেলে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, আই এ্যাম সরি অরুণবাবু, আমার ঘরে গেলেও ·এর বেশি বোঝাবার

ক্ষমতা আমার হবে না, কাজেই আমার ঘরে শুধু শুধু না গিয়ে আপনি বরঞ্চ ছোটসাহেবের ঘরে গিয়েই ব্যাপারটা বুঝে আসবেন। বলেই সেখানে আর অপেক্ষা করে না সবিতা।

সবিতার কথায় সেই মুহূর্তে দারুণ লজ্জিত হয়ে ওঠে অরুণ। সহকর্মীদের মুখের দিকে না তাকিয়েও তাদের মুখের চাপা হাসি কিন্তু নজর এড়ায় না তার। ফাইলের আড়ালে নিজের লজ্জাটুকু লুকোতে চেষ্টা করে অরুণ মনে মনে কেবল বললে, আচ্ছা দেখা যাবে !

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল সবিতার। একে ডালহৌসি পাড়ায় অফিস ছুটির পরে মিনিবাসে লাইন, তার ওপর রাস্তায় জ্যাম্। ডালহৌসি থেকে শোভাবাজার—এইটুকু পথ পাড়ি দিতে পাকা দেড় ঘণ্টা সময় লাগলো, তাও ড্রাইভার ছোকরাটি বেশ ওস্তাদ ছিল বলে। তাড়াতাড়ি ওভারটেক করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় আর একটু হলে একটা ঠেলাওয়ালার প্রাণ নিয়েছিল আর কি। অবশেষে একজন মোটরসাইকেল আরোহীর গালাগাল অম্লানবদনে হজম করে, ট্রাফিক কনস্টেবলের পকেটের নোটবইকে উপেক্ষা করে বাতাসের গতিতে গাড়ি চালিয়ে সবিতাকে যখন শোভাবাজারের মোড়ে নামিয়ে দিলে এবং সবিতা ফুটবোর্ড ছেড়ে নামতে না নামতেই ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তার পক্ষে সেই অপসৃয়মান গাড়ির দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে একবার তাকানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বাড়ি এসে স্নান সেরে শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিলে সবিতা। এই সময় মা নিভাননী একটু কাছে এলে ভালো লাগে তার, কিন্তু অফিস থেকে ফিরে কোনদিনই সে সেই বৃদ্ধা মহিলার দেখা পায় না। এই সময় তিনি থাকেন তার ঠাকুর ঘরে। সেখান থেকে বেরোতে বেরোতে রাত প্রায় আটটা।

খাবার টেবিলে বসে সবে চায়ের কাপটা মুখে তুলেছে সবিতা, ঠিক্ এইসময় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তার বৌদি বাসন্তী। প্রায় প্রৌঢ়া এই বাসন্তীই সংসারের কর্ত্রী।

সবিতার মুখোমুখি টেবিলের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে গম্ভীর কণ্ঠে বাসন্তী বললেন, কাল বিকেলে ভবানীপুর থেকে ওরা আসবেন। তুমি কাল অফিসে যেও না।

বাসন্তী জানেন সবিতার পক্ষে যখন তখন হুট্ করে অফিস কামাই করা সম্ভব নয়। তিনি আরও জানেন এধরনের অনুরোধে সবিতা বিরক্ত হয়, তবুও জেনে শুনেই মিষ্টি সুরে কথাটা বললেন তিনি। কিন্তু বাসন্তীর কণ্ঠস্বরের ধরনই এমনি যে তাঁর মিষ্টি কথাও যেন কেমন কঠিন কঠোর শোনায়। দীর্ঘকাল একটা মেয়েস্কুলে হেড্ মিস্ট্রেস্গিরি করে করেই তাঁর এমনি অবস্থা।

অস্বাভাবিক গম্ভীর প্রকৃতির, হাসতে প্রায় জানেন না বললেই চলে। সাধারণ একটা কথাও আদেশের মত শোনায়। চশমার পুরু লেন্সের ফাঁকে তাঁর বড় বড় চোখ দু'টোতে সর্বদাই যেন শাসনের দৃষ্টি। এ দৃষ্টি থেকে স্কুলের মেয়েরা তো বটেই এমনকি বাড়ির কারুরও রেহাই নেই, এমনকি সবিতার বৃদ্ধা মা নিভাননী কিম্বা তার দাদা ডাকসাইটে এ্যাড্‌ভোকেট পবিত্রেরও নয়। ঘরে বাইরে সমান দাপট বাসন্তীর।

এই বয়সেও বৌদির কথার ওপর কথা বলার সাহস নেই সবিতার। বলতে গেলে এই নিঃসন্তান বৌদিই কোলেপিঠে করে তাকে মানুষ করেছে। দাদা পবিত্রের যখন বিয়ে হয় তখন সবিতার বয়স মাত্র চার। এর বছর দু'য়েক আগেই সবিতার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুঃখেই নিভাননী সেই থেকে নিজেকে ঠাকুরঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন। ছোট্ট সবিতার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছিল নববধূ বাসন্তীর ওপর। স্কুলের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট এই ননদটির দায়িত্বও নিখুঁতভাবে পালন করে গেছেন বাসন্তী। তাঁরই চেষ্টায় সবিতার ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া! বিখ্যাত ঐ মার্চেন্ট ফার্মে সবিতার এই চাকরির পেছনেও যথেষ্ট হাত ছিল বাসন্তীর।

বাসন্তীর কথায় সবিতা একবার তাঁর মুখের দিকে তাকায়। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, কাল কি অফিস কামাই না করলেই নয়?

—কেন, কাল কি অফিসে বিশেষ কোন কাজটাজ আছে? ননদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন বাসন্তী।

একটু সময় চুপ করে থাকে সবিতা। তারপর জবাব দেয়, না, তেমন কিছু নয়। তবে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ অফিসে না গেলে খুব অসুবিধে হয়। ছোট সাহেব এটা খুব অপছন্দ করেন।

—পছন্দ না করলেও কিছু উপায় নেই, বলতে থাকেন বাসন্তী, ভবানীপুরের ও'রা নিজেরাই দিনক্ষণ ঠিক করে কোর্টে তোমার দাদাকে খবর পাঠিয়েছেন। ডক্টর বোস ব্যস্ত মানুষ। যখন তখন তাঁর পক্ষে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি নিজে যখন সময় করে আসবেন বলেছেন তখন কাল তোমার অফিসে যাওয়া কিছুতেই চলবে না।

সবিতা আর কিছু না বলে নিঃশব্দে চা খেতে থাকে। তারপর একসময় খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে রেখে বৌদির দিকে তাকিয়ে বললে, তাঁরা তো বিকেলের দিকে আসবেন?

মাথা নেড়ে সায় দেন বাসন্তী। সবিতা আবার বললে, তা'হলে গোটা দিন বাড়িতে না থেকে বেলা দু'টো আড়াইটে নাগাদ অফিস থেকে চলে এলেই তো হয়।

—না, তা' হয় না, আরও একটু গম্ভীর শোনায় বাসন্তীর কণ্ঠস্বর। তারপর সহসা তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, তাঁরা আসছেন তোমাকে দেখতে। বাস-ট্রামের ভিড়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে তুমি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াবে তা' হতে পারে না। কাল সারাদিন বাড়িতে থেকে বিশ্রাম করবে তুমি। বাসন্তী কথাগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন যেন জজসাহেব এজলাসে বসে মামলার রায় শুনিয়ে তাঁর খাস কামরায় উঠে গেলেন, যেন এই রায়ের ওপর আর কোন আপিল নেই।

সত্যিই আপিল নেই। এই সংসারে বাসন্তীর কথাই শেষ কথা। বৃদ্ধা নিভাননী সব ব্যাপারেই পুত্রবধূর ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত। পুত্র পবিত্র আদালতে যতই কেন না ঝানু এ্যাড্‌ভোকেট বলে পরিচিত হোন, এমনিতে তিনি শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির। বিশেষ করে, সাংসারিক বিষয়ে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। সংসারের কোন খোঁজ-খবরও রাখেন না। সারাদিন থাকেন আদালতে, আর সকাল-বিকাল বাইরের ঘরে মক্কেল, জুনিয়র এ্যাড্‌ভোকেট ও আইনের মোটামোটা বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন।

সবিতার বিয়ের ব্যাপারেও বাসন্তীই সর্বময় কর্ত্রী। পি-জি-হাসপাতালের বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ও ভবানীপুরের বোস পরিবারের উজ্জ্বলতম ব্যক্তি ডাঃ এস্. বোসের একমাত্র বিলেতফেরত ইঞ্জিনীয়ার পুত্র সব্যসাচী বোসের সঙ্গে সবিতার বিয়ের কথাবার্তাও চালাচ্ছিলেন বাসন্তী। এর আগে পাত্রপক্ষ দু'বার এসে পাত্রীকে দেখে গিয়েছিল। এবার পাত্রের বাবা নিজেই আসছেন। সবিতার বিয়ের কথা নিয়ে একদিন বাসন্তী স্বামীকে যেন কি বলতে গিয়েছিলেন। জবাবে পবিত্র এমন বিব্রত ভঙ্গিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন যে তা দেখে বাসন্তীর গম্ভীর মুখেও সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। স্বামীকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠেছিলেন, থাক—থাক, তোমাকে আর জবাব দিতে হবে না। তুমি তো চিন্তাভাবনাহীন মুক্ত পুরুষ! বোনের বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোন দায় নেই, যত দায় আমার ননদের বিয়ে নিয়ে।

হাতের সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে পায়ে শ্লিপার গলিয়ে বাইরের ঘরে যেতে যেতে পবিত্র কেবল জবাব দিয়েছিলেন, তুমি তো কেবল সুবুর বৌদিই নও, তুমিই তো ওর সত্যিকারের মা। আমার মা তো সুবুকে কেবল পেটেই ধরেছিলেন। এই চব্বিশ বছর ধরে ওর ভালো-মন্দ সবকিছুই তো নির্ভর করে আছে তোমার ওপর।

স্বামীর কথায় সেইমুহূর্তে নিঃসন্তান বাসন্তীর মনটা আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলেও তার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই আনন্দটুকু মনে মনে কেবল উপভোগ করেছিলেন তিনি।

(দুই)

পাত্রীকে দেখে ডাঃ বোসের এতই পছন্দ হয়েছিল যে তিনি সেদিন একরকম কথাই দিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র ও বাসন্তীকে। বাসন্তীর প্রশ্নের জবাবে ডাঃ বোস বলেছিলেন, না, আমার ছেলে নিজে পাত্রী দেখতে আসবে না। দেখার পর্ব এখানেই শেষ। আপনারাও একদিন আমার ওখানে আসুন, দেখে যান আমার ছেলেকে। দু'তরফের পছন্দ হলে তারপরেই কথাবার্তা হবে। কথাবার্তার আর আছেই বা কি। পছন্দটাই তো আসল।

সবিতার মনে আনন্দের শিহরণ। বিখ্যাত পিতার কৃতী পুত্র। অফিসে নিজের বিয়ের কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল সবিতা। তা'ছাড়া, অফিসে বলার মত ঘনিষ্ঠ তার ছিলও না কেউ। বাসন্তীও সাবধান করে দিয়েছিলেন সবিতাকে। বলেছিলেন, অফিস স্টাফদের হাতে বিয়ের কার্ড ধরিয়ে দেবার আগে কথাটা যেন কেউ জানতে না পারে। এসব কথা পাঁচকান করতে নেই।

জবাবে হালকা মেজাজে বলেছিল সবিতা, অফিসে এসব কথা বলতে আমার বয়েই গেছে। সেখানে বলার মত কেউ নেইও আমার।

সবিতার কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন বাসন্তী। তারপর চিন্তিত কন্ঠে আবার বললেন, আমার আসল ভয় কাতুপিসিকে নিয়ে। তিনি তো এখনও আশায় আছেন। ব্যাপারটা টের পেলে তিনি যে কি কান্ড করে বসবেন!

অফিসে সবিতার স্তাবকদলের মধ্যে একজন হচ্ছে রথীন চ্যাটার্জী। রথীন জুনিয়র ক্লার্ক। উঠতি আধুনিক কবি সে। মাঝে মাঝেই সে সবিতার ঘরে এসে তাকে নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাতে পীড়াপীড়ি করতো। সবিতা কখনও কাজের দোহাই দিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করতো, কখনও বা ধৈর্য ধরে শুনতো।

একদিন সেই রথীন টিফিনের সময় হাসি হাসি মুখ করে সবিতার ঘরে এসে বললে, একটা সুখবর আছে, মিস্ ঘোষ।

—তাই নাকি? মৃদু হেসে সবিতা তাকায় রথীনের দিকে।

সবিতার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসতে বসতে রথীন ঘনিষ্ঠ সুরে নীচু কন্ঠে বললে, অফিসের কাউকে এখনও বলিনি। আপনাকেই প্রথম বলছি।

কৌতুহলী সবিতা জিজ্ঞেস করে, ছোটসাহেব স্পেশাল ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন নাকি?

—আরে না-না, ওসব ইনক্রিমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট তো তাদেরই হয় যারা নিয়মিত ছোট সাহেবকে তেল দিতে পারে।

কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় রথীনের খেয়াল হয় যে আগের বছর সবিতারও মোটা টাকা স্পেশাল ইন্‌ক্রিমেন্ট হয়েছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে আবার বললে, অবশ্যি আপনার কথা আলাদা। আপনি স্পেশাল ইন্‌ক্রিমেন্ট পেয়েছিলেন কাজ দেখিয়ে। কথাটা শেষ করেই বিব্রত ভঙ্গিতে সে তাকায় সবিতার দিকে।

রথীনের ভাব-ভঙ্গিতে মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করছিল সবিতা। তাই, রথীন থামতেই সে জিজ্ঞেস করে, স্পেশাল ইন্‌ক্রিমেন্ট যখন নয় তখন আর কী সুখবর নিয়ে এসেছেন, রথীনবাবু?

মুখের হাসিটুকু দীর্ঘায়িত করে জবাব দেয় রথীন, আমার একখানা কবিতার বই ছাপা হচ্ছে—আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

মনে মনে নিরাশ হলেও মুখে উৎসাহের সুর ফুটে ওঠে সবিতার। হেসে বললে, তাই নাকি? ভালোই তো। তা' কারা বইটা ছাপাচ্ছে?

রথীন একজন প্রখ্যাত প্রকাশকের নাম করতেই সবিতা আবার বললে, ওরা তো শুনেছি একমাত্র বিখ্যাত লেখকদের বই-ই ছাপে।

—ঠিকই শুনেছেন, সবিতার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বলতে থাকে রথীন, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবির কাব্যগ্রন্থই ওরা ছাপে।

—সবিতা বললে, তা'হলে তো বলতে হয় আপনার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থখানিও বেশ উঁচু মানের।

সবিতার কথায় বিগলিত হয়ে ওঠে রথীন। একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললে, এর অনেকগুলো কবিতাই আপনাকে পড়ে শুনিয়েছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তবে আর একটা কথা—। একমুহূর্ত ইতঃস্তত করে রথীন। তারপর বলেই ফেললে, আমার সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি আমি আপনাকেই উৎসর্গ করবো বলে মনে মনে ঠিক করেছি।

কথাটা শুনেই প্রায় আঁৎকে ওঠে সবিতা। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সেকি রথীনবাবু, ওটা আমার নামে উৎসর্গ করবেন কেন? আমি কবিতার কি বুঝি?

—নাই বা বুঝলেন আপনি। আমি লেখক, আমার যাকে ভালো লাগবে তাকেই আমি উৎসর্গ করবো।

সর্বনাশ, এই উঠ্‌তি কবি বলে কি? কান দু'টো সেই মুহূর্তে লাল হয়ে ওঠে সবিতার। একটু সময় চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে অনুনয়ের সুরে সে আবার বললে, না—না রথীনবাবু, একাজ আপনি করবেন না। আপনার যখন জিনিস তখন আপনি তা' নিশ্চয়ই যাকে ইচ্ছে উৎসর্গ করতে পারেন। সে এক্তিয়ার আপনার অবশ্যই আছে। তবে যাকে উৎসর্গ

করছেন তার পক্ষে তা' গ্রহণ করার মত সামর্থ্য আছে কিনা তাও তো একবার বিবেচনা করে দেখবেন।

সবিতার কথায় কিছুক্ষণ চুপ্ করে থাকে রথীন। জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থখানাকে ঘিরে যে কল্পনা তার মনখানাকে রঙীন করে তুলেছিল সেই রঙ সবিতার কথায় যেন অনেকটাই ফিকে হয়ে ওঠে। বইখানার উৎসর্গের ব্যাপারে দাতার দানের গৌরবের কথাটাই সে বরাবর মনে করেছে, গ্রহীতাও যে একটা পক্ষ, দানের অধিকারের মত গ্রহণের অধিকারও যে গ্রহীতার থাকতে পারে সেকথা তখনও তার মনে উদয় হয়নি। তাই তার বইখানি গ্রহণ করতে সবিতা অনিচ্ছা প্রকাশ করায় স্বাভাবিক ভাবেই মনটা একটু দমে যায় তার। তবুও কিন্তু শেষ চেষ্টা করতে সে ছাড়ে না। বললে, বইখানি গ্রহণ করার মত সামর্থ্য আপনার নেই একথা আপনি ভাবছেন কেন, মিস্ ঘোষ? না-ই বা আপনি কবিতা বুঝলেন, কিন্তু তাই বলে কবিতার বই গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়?

বিব্রত কন্ঠে জবাব দেয় সবিতা, আমার কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, রথীনবাবু। এসব বই তার হাতেই মানায় যে এর সঠিক রসাস্বাদন করতে পারে। কোন বিখ্যাত কবি কিম্বা কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের হাতে বইখানা তুলে দিলেই ব্যাপারটা মানাবে। তাই বলছিলাম তেমন কোন ব্যক্তিকেই এটা উৎসর্গ করুন।

রথীন তবুও নাছোড়বান্দা। অনুনয়ের সুরে সে বলতে থাকে, দয়া করে আপনি না করবেন না, মিস্ ঘোষ। দেখুন, কারুর নামে কিছু উৎসর্গ করা তার প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ। আমি আপনাকে—

রথীনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রায় কাঠ হয়ে ওঠে সবিতা, সর্বনাশ, এই ভাবুক কবি এখনই হয়তো এমন কিছু উচ্চারণ করে বসবে যা শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করবে তার।

রথীন কিন্তু ততক্ষণে তার মুখের কথাটা শেষ করে ফেলেছে। না, তেমন কোন বিপদ্‌জনক শব্দ সে উচ্চারণ করেনি। কেবল বলেছে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, মিস্ ঘোষ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে সবিতার। একটু সময় চিন্তা করে সে, তারপর মৃদু কন্ঠে বললে আমাদের সমাজে মেয়েদের ব্যাপারে বাধানিষেধ অনেক বেশি। আপনার ঐ বইটার কথাই ধরুন। ওটা আমার নামে উৎসর্গ করবেন আপনি। এ নিয়ে দশজনে দশ কথা বলবে। হয়তো ঠাট্টা-তামাশাও কেউ কেউ করবে। এতে আপনাদের হয়তো কিছু যায়-আসে না, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের অনেক কিছুই যায়-আসে। তাই বলছিলাম—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সবিতা।

মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে রথীনের। একটা নিরাশার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে সেই মুখে। একটু সময় চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। তারপর বললে, আপনার দিক থেকে কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। বেশ, আমার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি না হয় অন্য কারুর নামেই উৎসর্গ করছি, তবে দ্বিতীয়খানা কিন্তু আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

—বেশ—বেশ, তাই হবে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সবিতা। যাক্, আপাততঃ তো বাঁচা গেল! নব্য কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের দশা দেখার পরে দ্বিতীয়খানা ছাপাবার মত প্রকাশক যদি একান্তই তার জুটে যায় তখন না হয় ব্যাপারটা চিন্তা করা যাবে। ততদিনে সে এই অফিসে চাকরি করবে কিনা তারই বা ঠিক্ কি? বিয়ের পরে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবিতার চাকরি করাটাকে পছন্দ নাও করতে পারে।

অফিসের ছোটসাহেব সজল মিত্র নামে ছোটসাহেব হলেও ক্ষমতায় কিন্তু মোটেই ছোট নন। অফিসের সর্বময় কর্ত্তা হচ্ছেন তিনি। এই অফিসে বড় সাহেব নামে যদিও একজন বিলিতি সাহেব আছেন, কিন্তু অফিস এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন তিনি দেখেন না। তিনি সর্বদাই ব্যস্ত কোম্পানীর পলিসি ম্যাটার নিয়ে। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই তাঁর নেই। তিনি ইম্পালা গাড়ি চেপে অফিসে এসে সোজা গিয়ে ঢোকেন নিজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। ডাইরেক্টর বোর্ডের হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরা আসেন তাঁর কাছে, অন্য দেশের কোম্পানীর প্রতিনিধিরাও প্রায়ই আসেন, মাঝে মাঝে সজল মিত্রের ডাকও পড়ে তাঁর ঘরে। কিন্তু অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের ডাক পড়ে না কখনও। তারা মাঝে মাঝে ভুলেই যায় যে তাদের এখানে একজন বড়সাহেব আছেন। তাদের যা কিছু যোগাযোগ তা' কেবল ঐ ছোটসাহেব সজল মিত্রর সঙ্গে।

বিলেতফেরত সজল মিত্রের আকৃতি যেমন গম্ভীর, প্রকৃতিও তেমনি কড়া। বয়স যদিও তেমন বেশি নয়, কিন্তু সেকালের বিচারকদের পাকাচুলের উইগ্ অর্থাৎ পরচুলা পরে প্রবীণের বেশ ধরার মত সজল মিত্রও নিজের মুখের ওপর সর্বদা একটা গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে নিজের নবীনত্বকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। অফিস এটিকেটে কেতা দুরস্ত, অত্যন্ত ডিসেপ্লিন্ড, স্পষ্টবাদী এই ছোটসাহেবটিকে নিয়ে অফিসের কর্মচারীরা সময় সময় যেমন নিশ্চিন্ত তেমনি মাঝে মাঝে আবার বিব্রতও বটে। অফিসে লেট্ এ্যাটেন্ডেন্সের যম তিনি। আবার যুক্তিসম্মত লেট্-এ্যাটেন্ডেন্স মাফ্ করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত— এমনকি তাতে ক্যাজুয়েল লীভও কাটা যায় না। অফিসের অলস কর্মীকে তিনি পদে পদে নাস্তানাবুদ করেন, বিশেষ করে যদি বুঝতে পারেন যে কর্মীটি ইচ্ছে করে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে তা'হলে আর রক্ষা নেই তার। কিন্তু যদি

বুঝতে পারেন যে কর্মীটি কাজ-কর্মে তেমন সড়গড় নয় তা'হলে কাজ শিখে নিতে তাকে অঢেল সময় দেন তিনি। অফিসে কাজের সময় হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না—এমনকি কাজের ফাঁকেও নয়। বলেন, কাজ হচ্ছে সাধনা। নিরবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা নিয়ে এই সাধনা করতে হবে। একাগ্রতায় ঘাটতি হলে কাজের গতি কমে যায়। ভালো কাজের জন্যে ইনক্রিমেন্ট দিতে তিনি দরাজহস্ত—সময় সময় কর্মীর আশাকেও তা' ছাড়িয়ে যায়। আবার কোন কোন কর্মীকে বছরের পর বছর একই মাইনেতে কাজ করে যেতে হয়। একটি পয়সাও ইনক্রিমেন্ট হয় না। তদ্বির করতে গেলে বলেন, ইনক্রিমেন্টের উপযুক্ত হতে চেষ্টা করুন, পাবেন। আমার চোখে কিছুই এড়াবে না।

সবিতার কাজে ছোটসাহেব বাস্তবিকই খুশি। আর, সেকথা মাঝে মধ্যে সবিতাকে শোনাতেও কার্পণ্য করেন না তিনি। বলেন, আই এ্যাম রিয়েলি সেটিস্‌ফায়েড্ উইথ ইউ মিস ঘোষ। জীবনে যদি উন্নতি করতে চান তা'হলে এমনি হার্ট এ্যান্ড সোল দিয়েই কাজ করতে হবে। সিন্‌সিয়ারিটি ব্যাপারটা স্রেফ প্রাক্‌টিস্। যতই অনুশীলন করবেন ততই বাড়বে।

সবিতা যদিও অফিসের রিসেপ্‌শনিস্ট, কিন্তু অফিসে তাকে ফাইল ওয়ার্কও করতে হয় প্রচুর। মাথা দুলিয়ে যান্ত্রিক হাসির সাহায্যে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করলেই কেবল তার কাজ শেষ হয় না। ছোটসাহেবের কাছ থেকে প্রতিটি ফাইল প্রথমে আসে তারই কাছে। সাহেবের নোট পড়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক এ্যাক্‌শন নিয়ে সে আবার সেগুলো পাঠিয়ে দেয় বিভিন্ন দপ্তরে।

সেদিন এমনি কয়েকটা জরুরী ফাইল নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছিল সবিতা। সকাল থেকেই সেদিন দর্শনার্থীর ভিড়। ছোটসাহেবের কাছেই অধিকাংশ। তাদের ঠিকমত আপ্যায়ন অভ্যর্থনা করে ছোটসাহেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে একটু অবসর মিলতেই টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটা জরুরী ফাইল টেনে নেয় নিজের কাছে।

একটা ফাইল খুলে সবিতা সবে তাতে নজর দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘরে এসে ঢোকে দিব্যেন্দু। অফিসের সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট দিব্যেন্দু সান্যাল কেবল একজন নাট্যকারই নয়, পরিচালকও বটে। অফিস ক্লাবের নাট্যসংস্থাগুলোর কাছে দিব্যেন্দুর যথেষ্ট দাম। তা' ছাড়া তার নিজের নাট্যসংস্থাও রয়েছে। নাটক অন্ত-প্রাণ বলতে যা বোঝায় দিব্যেন্দু হচ্ছে তাই। শয়নে স্বপনে তার নাটক। নিজের সাধারণ কথাবার্তায়ও যেন নাটকের স্পর্শ।

দিব্যেন্দু তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সবিতার মধ্যে নাকি একজন উঁচুদরের অভিনেত্রীর সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিল। অন্ততঃ সেকথাই সে প্রচার করেছিল

অফিসের কর্মীমহলে। সেই সূত্রে সে সবিতাকে নিজের দলে টেনে আনার জন্যে চেষ্টার ত্রুটিও করে নি। তার নাট্য সংস্থার বেস্ট্ প্রোডাক্শনের একখানা কমপ্লিমেন্টারী কার্ডের জন্যে অফিসের কর্মীরা যেখানে দিব্যেন্দুকে অনুরোধ-উপরোধ করে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, সেখানে দিনের পর দিন দিব্যেন্দু সবিতার পিছু পিছু কার্ড নিয়ে ঘুরে বেরিয়েও নাটক দেখতে তাকে রাজি করাতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় দিব্যেন্দু। 'সবুরে মেওয়া ফলে' নামক আপ্ত বাক্যটি তার অজানা ছিল না রবার্ট ব্রুসের মত ধৈর্য নিয়ে সে অপেক্ষা করছিল সবিতার জন্যে। তার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল একদিন সে এই সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটির মন ভেজাতে পারবেই।

দিব্যেন্দুকে ঘরে ঢুকতে দেখে মনে মনে সংকিত বোধ করে সবিতা। ভদ্রলোক এখনই শুরু করবে নাটুকেপনা। আর, তার ফলে মাটি হবে সবিতার কাজ। আজকের ফাইলগুলোর জের টানতে হবে পরের দিন পর্যন্ত।

সবিতার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করে দিব্যেন্দু, খুব ব্যস্ত নাকি, মিস-ঘোষ ?

—না—না, এমন আর কি ব্যস্ত। জোর করে মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয় সবিতা, কয়েকটা আর্জেন্ট ফাইল রয়েছে ছোট সাহেবের। তা' আপনার খবর কি ? কোন দরকার আছে নাকি ?

আমতা আমতা করে জবাব দেয় দিব্যেন্দু, না, অফিসিয়াল কিছু নয়। কলকাতার নাট্যামোদীদের অনুরোধে আমাদের এবছরের সেই মঞ্চসফল নাটকটা আগামীকাল আমরা আবার মঞ্চস্থ করছি একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী হবেন প্রধান অতিথি। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত থাকবেন। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি একখানা কমপ্লিমেন্টারী কার্ড নিয়ে হলে যাবেন।

বলতে বলতে দিব্যেন্দু নিজের পকেট থেকে কার্ড বের করার উদ্যোগ করতেই সবিতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এক্সকিউজ মী দিব্যেন্দুবাবু, কাল অফিসের পরে আমাকে সোজা বাড়ি ফিরতে হবে। একটা জরুরী কাজ আছে।

ম্লান হয়ে ওঠে দিব্যেন্দুর মুখখানা। সে কিছু বলার আগেই সবিতা আবার বললে আপনাদের ঐ নাটকটার নাম তো 'প্রতিশ্রুতি,' তাই না ? আমাদের দেশের সমাজ জীবনটা যে কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এটাই তো সেই নাটকের বক্তব্য।

সবিতা যতক্ষণ কথা বলছিল দিব্যেন্দু কেবল বিস্মিত চোখে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। সবিতার কথা শেষ হতেই দিব্যেন্দু সোৎসাহে বলে ওঠে, আপনি এত জানলেন কি করে, মিস্ ঘোষ ? যতদূর জানি আপনি তো ঐ নাটকটি কখনও দেখেন নি।

মৃদু হেসে জবাব দেয় সবিতা, না দেখলেও শুনেছি, এবং শুনেছি আপনারই কাছে।

—এবার না হয় একবার দেখুন। মিনতির সুর দিব্যেন্দুর কণ্ঠে।

সবিতা সেকথার জবাব না দিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, আপনাদের এই নাটকের অনুষ্ঠানে সঠিক ব্যক্তিকেই আপনারা প্রধান অতিথি মনোনয়ন করেছেন। রাইট ম্যান্ ফর দি রাইট জব। 'প্রতিশ্রুতি' নাটকের প্রধান অতিথি রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী।

সবিতার কথায় হেসে উঠে দিব্যেন্দু বললে, যা বলেছেন, মিস্ ঘোষ। অন্য কোন মন্ত্রীকে পেলাম না বলেই শেষে ওঁকে গিয়ে ধরলাম।

—এবং ধরতেই রাজি হয়ে গেলেন, কেমন? কৌতুক কণ্ঠে বললে সবিতা।

—প্রায় সেই রকম। হাসতে হাসতে জবাব দেয় দিব্যেন্দু। তারপর একটু থেমে আবার বললে, তা'হলে কাল আমাদের শো'তে আপনি আসছেন তো, মিস্ ঘোষ?

- বললাম তো আপনাকে, কাল আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

—কিন্তু আমি যে এদিকে আমার ইউনিটের লোকদের বলেছি এবার আপনাকে হাজির করবোই।

—আমাকে না জিজ্ঞেস করে আপনি তাদের একথা বলতে গেলেন কেন? তা' ছাড়া, তারাই বা আমার সম্পর্কে এমন ইন্টারেস্টেড্ হয়ে উঠলো কেন? হাসির বদলে এবার একটু গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞেস করে সবিতা।

সবিতার কন্ঠস্বরের গাম্ভীর্যটুকু কিন্তু নজর এড়ায় না দিব্যেন্দুর। লজ্জিত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, এর জন্যে অবশ্য আমিই দায়ী, মিস্ ঘোষ। আপনার মধ্যে যে অভিনয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি আমাদের সংস্থায় এলে আমরা যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবো সেকথা তাদের আমিই বলেছি।

নিজেকে নিয়ে একটা অপারচিত নাট্যসংস্থার লোকদের এমন কৌতূহল ঠিক ভালো লাগছিল না সবিতার। আর এ জন্যে এই মুহূর্তে তার সামনে বসা এই লোকটাই যে দায়ী একথা মনে হতেই দিব্যেন্দুর ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিল তার প্রচার-বিমুখ মনটা। তেমনি গম্ভীর সুরেই সে আবার বললে, আমাকে এরকম একটা আলোচনা ও কৌতূহলের বস্তু না করে তুলতেই পারতেন, দিব্যেন্দুবাবু। আমি এসব একেবারেই পছন্দ করি না।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দেয় দিব্যেন্দু, এটা আপনার একটা কতবড় পাব্লিসিটি জানেন?

—না জানি না। জানতে চাইও না। স্পষ্ট বিরক্তির সুরেই এবার জবাব

দেয় সবিতা, আই অ্যাম সরি দিব্যেন্দুবাবু, পাব্‌লিসিটি যারা পছন্দ করে আমি সে দলে নেই। কাজেই ভবিষ্যতে দয়া করে আমাকে নিয়ে এধরনের পাব্‌লিসিটি আর দেবেন না।

না, মৃদু অনুরোধ নয়, দৃঢ় আদেশ। উপরোধ নয়, স্পষ্ট উপেক্ষা। সেই মুহূর্তে সবিতার বলার ধরনে নিজেকে অপমানিত বোধ করে দিব্যেন্দু। ইস, সৌন্দর্যের দেমাকে মাটিতে যেন পা পড়ে না!

অপমানিত দিব্যেন্দু একটু সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে সবিতার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, বেশ আপনার কথা আমার মনে থাকবে। বলেই দিব্যেন্দু দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

সবিতা বিরক্ত চোখে কয়েক মুহূর্ত তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় মন দেয় নিজের কাজে।

(তিন)

কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এস. বোস চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র সব্যসাচী তাঁর নিজের মত ডাক্তার হোক। কিন্তু সব্যসাচীর পছন্দ ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং। অনেক টানাপোড়েনের পরে শেষ পর্যন্ত ছেলের মতেই মত দিতে হয়েছিল তাঁকে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিল সব্যসাচী। অবশেষে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত। সেখান থেকে আরও কয়েকটা নামী দামী ডিগ্রী সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসতেই দিল্লীর একটা বিখ্যাত পাঞ্জাবী ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম প্রায় লুফে নিলে সব্যসাচীকে। তাদের কলকাতার অফিসে পোস্টিং করলে তাকে।

দেখতে শুনতে বাস্তবিকই সুপুরুষ সব্যসাচী। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ্। কথাবার্তা, চালচলনেও অতিশয় ভদ্র। তার সবচাইতে বড় গুণ, দেমাক বলে কোন পদার্থই তার চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অল্প বয়সে এত বড় একজন ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু তাই বলে নিজের সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন নয় সে। অফিসের সাধারণ পিওন থেকে শুরু করে জুনিয়র ক্লার্ক পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গেই সে অসঙ্কোচে মেলামেশা করে। অফিসের প্রতিটি কর্মীই পছন্দ করে তাকে। বিশেষ করে, অফিসের মহিলা কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ যে এই যুবকটি সম্পর্কে একটু অতিরিক্ত সচেতন ও স্পর্শকাতর তা' তাদের কথাবার্তার

মাধ্যমেই ধরা পড়ে। সব্যসাচীর কিন্তু এসবে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ নেই। বন্ধুদের মধ্যে কেউ এসব নিয়ে কিছু ইঙ্গিত করলে সব্যসাচী সামান্য একটু হেসে ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

সেদিন অফিস ছুটির পরে অফিসের গেটের কাছেই সব্যসাচীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বন্দনার। আলট্রা-মডার্ণ মহিলা বন্দনা আচার্য এই অফিসেরই কর্মী। একটু গায়ে-পড়া স্বভাব হলেও বন্দনা দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। একটা সপ্রতিভতার ছাপ্ সর্বদাই লেগে থাকে তার চোখে-মুখে। অফিসের লম্বা করিডরে সব্যসাচীর সঙ্গে দেখা হলেই বন্দনার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। সব্যসাচীর ব্যস্ততায় ভ্রূক্ষেপ না করে সে এগিয়ে যায় তার দিকে। তারপর দু' একটা সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে বুজ মাখানো ঠোটের ফাঁকে একটু হেসে, শ্যাম্পু-করা ফাঁপা চুলের বোঝা দুলিয়ে, আর সেই সঙ্গে বিলিতি কায়দায় ঈষৎ ঘাড় নাচিয়ে অবশেষে সব্যসাচীকে রেহাই দেয় বন্দনা। সব্যসাচী বন্দনার এই গায়েপড়া স্বভাবটাকে তেমন পছন্দ না করলেও মনে মনে হেসে উপভোগ করতে ছাড়ে না। অফিসের বন্ধুদের মধ্যে কেউ হয়তো বলে, এটা কিন্তু তোমার ভয়ানক অন্যায়, সব্যসাচী।

বন্ধুর মুখের দিকে নিজের টানা চোখজোড়া তুলে জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী, কোন্‌টা অন্যায় ?

—ঐ বন্দনা আচার্যের ব্যাপারটা। ওর ঐ লোভকে এমন উস্কে দিয়ে মজা করা তোমার উচিত নয়।

বন্ধুর কথায় একটু ম্লান হেসে সব্যসাচী বলে, ভুল করছো তুমি। কারুর লোভ উস্কে দেওয়া কিম্বা তাতে জল ঢেলে নিবিয়ে দেওয়া, কোনটাতেই আমি ইন্টারেস্টেড্ নই। ভদ্রমহিলা দেখা হলেই আমার সঙ্গে কথা বলেন, হয়তো বা একটু ঘনিষ্ঠ হতে চান। আমিও এমন একটা ভাব দেখাই যেন আমিও তার সম্পর্কে অমনোযোগী নই। ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত। একে যদি তোমরা উস্কে দেওয়া বলো তো আমি ভাই নাচার। একজন মহিলার কথার জবাবে নিজের মুখখানাকে রামগড়ুরের ছানার মত করে রাখার ইচ্ছে আমার নেই।

বন্ধু হয়তো বলে, প্রশ্রয় না দিলেই তো পারো।

—প্রশ্রয় আমি দিই না, জবাবে সব্যসাচী বলে, কিন্তু তাই বলে আমি উপেক্ষাও করি না। কাউকে উপেক্ষা করাটাকে আমি অভদ্রতা বলেই মনে করি।

—কিন্তু তোমার এই উপেক্ষা না করাটাকে কেউ যদি প্রশ্রয় বলে ধরে নিয়ে মনে মনে তোমাকে নিয়ে কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে তা'হলে কি হবে ?

—কিছুই হবে না। সে তা' করবে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না তাতে।

বন্ধুটি হয়তো একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে, তুমি হয়তো টের পাচ্ছো না, কিন্তু অফিসের আনাচে-কানাচে তোমার নামের সঙ্গে বন্দনার নাম জড়িয়ে আলোচনা চলে।

হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, একান্তই যদি চলে তো আমি তার কী করতে পারি? যা সত্যি নয় তার প্রতিবাদ করতে যাওয়াও বোকামী।

অফিস গেটে বন্দনার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সব্যসাচী তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে তাকায় তার দিকে। মুহূর্তে বন্দনার মুখখানাও আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। হাতের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে চোখের ওপর নেমে আসা দুরন্ত চুলের গোছাকে সরিয়ে দিয়ে কাছে এগিয়ে এসে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে যাক্, বাঁচলাম। ভেবে ভেবে এতক্ষণ সারা হচ্ছিলাম আমি।

বন্দনার কথায় সব্যসাচীর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে দুশ্চিন্তার ছায়া। তাকে দেখে বন্দনার হঠাৎ এমন নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণটি বুঝতে না পেরে সে কেবল তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

সব্যসাচীর মুখের ভাবটা কিন্তু নজর এড়ায় না বন্দনার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে, ওকি, অমন গম্ভীর হয়ে উঠলেন কেন?

মুখের ওপর একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে জবাব দেয় সব্যসাচী, না—না, গম্ভীর হবো কেন? বলুন না, এতক্ষণ কি নিয়ে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলেন?

মুচকি হেসে জবাব দেয় বন্দনা, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার দরকার ছিল আজ। এদিকে বাস-ট্রামে তো ওঠবার উপায় নেই। অফিস ছুটির পরে ট্রাফিক জ্যামের ফুল। তার, মিনিবাসের লাইন তো অজগরের বিরাট লেজের মত এঁকে-বেঁকে যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখান থেকে খোদ বাসটাকে দেখতে হলেও দূরবীনের প্রয়োজন হয়। এই অবস্থার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছিলাম কি করা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে আপনাকে দেখেই আপনার গাড়ির কথা মনে পড়লো।

গাড়ি অবশ্য সব্যসাচীর নিজের নয়, অফিসের। ইঞ্জিনীয়ার সব্যসাচীর স্থান অফিসের এক্‌জিকিউটিভের মধ্যেই। অল্পদিনের চাকরি। জুনিয়র হলেও অফিসার তো বটে সেই সূত্রে অফিস যাতায়াতের জন্য অফিস থেকেই গাড়ি পাবার অধিকারী সে।

বন্দনার কথায় সেই মুহূর্তে একটু অস্বস্তিবোধ করে সব্যসাচী। এতখানি নির্ভরতা তো ভালো নয়। সে নিজে অফিস এক্‌জিকিউটিভ, বন্দনা ক্লারিক্যাল স্টাফ্। এই অফিসে এক্‌জিকিউটিভরা অফিসের গাড়িতে সাধারণতঃ অন্য স্টাফ্‌দের

লিফ্‌ট দেয় না। এটাই নাকি অফিস এ্যাটিকেট। সব্যসাচী লক্ষ্য করেছে, খোদ্‌ বিলেতে কিন্তু এসব নিয়ম চালু নেই। তারা এসব ঠুনকো আভিজাত্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু যে দেশে যা নিয়ম। এখানে সব্যসাচী নিজেও এই নিয়ম মোটামুটি মেনে চলে। তবে বিশেষ কোন অবস্থায় এই নিয়ম ভাঙতেও সে পিছপা নয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে কিম্বা কোন কারণে হঠাৎ বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে সে গাড়ি বোঝাই করে অফিস স্টাফদেব বাড়ি পেঁাছে দেয়। কিন্তু তাই বলে নিজেব ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বন্দনা তার ওপর এতটা নির্ভর করবে কেন?

সব্যসাচীকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে বন্দনা, অবশ্যি আপনার যদি কোন অসুবিধা থাকে তা'হলে না হয় থাক্‌। আমি যে করেই পারি চলে যাবো।

একজন ব্যক্তির, বিশেষ করে একজন মহিলার এমনি বিপদে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার মত মনের প্রসারতা সব্যসাচীর যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেই মহিলা বন্দনা বলেই সব্যসাচীর যা একটু দ্বিধা। এমনিতেই তো তাদের দু'জনকে নিয়ে অফিসে কানাকানি চলে। যদিও এই কানাকানিকে সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে মোটেই আমল দেয় না সে। কিন্তু এই মুহূর্তে বন্দনাকে লিফ্‌ট দিলে ব্যাপারটা অফিসের কারুর না কারুর চোখে পড়বেই। আর তা' নিয়ে হয়তো অফিসে নতুন করে বইতে শুরু করবে আলোচনার ঝড়।

বন্দনার কথায় সব্যসাচী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, নো—নো মিস আচার্য, তেমন কোন অসুবিধে নেই। চলুন আমার সঙ্গে। বাড়িতে পেঁাছে দিচ্ছি আপনাকে।

স্টিয়ারিংয়ের সামনে অফিসের উর্দিপরা ড্রাইভার। পেছনের সীটে সব্যসাচী ও বন্দনা। গাড়ি গেট পেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়তেই সব্যসাচী লক্ষ্য করে একটা স্টপেজে অফিস-ফেরৎ যাত্রীরা ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের মধ্যে চার পাঁচ জন মহিলা সমেত তাদের অফিসের একদল কর্মচারীও রয়েছে।

সব্যসাচী ও বন্দনাকে নিয়ে গাড়িটা এগিয়ে যাবার সময় সব্যসাচী তাদের মুখে-চোখে লক্ষ্য করে স্পষ্ট কৌতূহলের চিহ্ন। দু'এক জনের মুখের চাপা হাসিটুকুও নজর এড়ায় না তার।

সব্যসাচী যাবে ভবানীপুর, আর বন্দনা ইন্টালী মার্কেটের কাছে। কাজেই সব্যসাচীর নির্দেশে ড্রাইভার বৌবাজার ধরে এগোতে থাকে সার্কুলার রোডের দিকে। গাড়ির একপাশে ঠেস্‌ দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল সব্যসাচী। সহসা বন্দনা বলে ওঠে, খুব অস্বস্তি লাগছে, তাই না?

অন্যমনস্ক সব্যসাচী প্রথমটায় কথাটা ঠিক্ শুনতে পায়নি। তাই সে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে বন্দনার দিকে তাকাতেই বন্দনা তার দিকে ঘুরে বসে হাসিমুখে আবার বললে, এই যে একরকম জোর করে আপনার গাড়িতে চেপে বাড়ি যাচ্ছি, এতে নিশ্চয়ই আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন ?

বন্দনার কথায় হঠাৎ ভয়ানক রাগ হয় সব্যসাচীর। ভারী কণ্ঠে সে জবাব দেয়, তাই যদি বুঝে থাকেন তা'হলে না চাপলেই তো পারতেন।

সব্যসাচীর কথায় ক্ষুণ্ণ হবার পরিবর্তে একটু জোরেই হেসে ওঠে বন্দনা। হাসতে হাসতে বললে, আপনি কিন্তু সত্যিই রেগে গেছেন।

সব্যসাচীও এবার হাসতে চেষ্টা করে জবাব দেয়, রাগের কথা বললে রাগ হওয়াই তো স্বাভাবিক। অস্বস্তি বোধই যদি করতাম তা'হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়িতে তুলতাম না।

—এক্সকিউজ মী, হঠাৎ প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে বন্দনা, রাগলে কিন্তু আপনাকে আরও চমৎকার দেখায়।

একটু সময় চুপ করে থাকে সব্যসাচী। তারপর সেও হালকা সুরে জবাব দেয়, তার মানে এমনিতে চমৎকার, রাগলে আরও চমৎকার, তাই তো ?

—সত্যিই তাই, হাসতে হাসতে বলতে থাকে বন্দনা, মেয়েদের একান্ত লোভনীয়।

বন্দনার কথায় স্তম্ভিত হয়ে যায় সব্যসাচী। একজন মহিলা যে নির্লজ্জের মত এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে তা তার পরিশীলিত মন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। নিজের কানে সে শুনেছে। তা ছাড়া বক্তা ঐ মহিলা তার পাশেই বসে রয়েছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বিতৃষ্ণায় মনটা রি-রি করে ওঠে সব্যসাচীর। সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছে হয় গাড়ি থেকে নেমে যেতে কিম্বা বন্দনাকে নামিয়ে দিতে।

বন্দনার কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সব্যসাচীর সারা মুখে যে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে সেদিকেও নজর নেই তার। অনেকটা আপন মনেই সে বলে ওঠে, অফিসে আমার সবচাইতে খারাপ লাগে কি, জানেন ?

সব্যসাচী কোন জবাব না দিয়ে কেবল বন্দনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়েই ঘাড় সরিয়ে নেয়।

বলতে থাকে বন্দনা, আপনার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে অফিসে যখন কানাঘুসো চলে সেকথা কানে এলেই আমার সবচাইতে খারাপ লাগে।

বন্দনার কথায় সব্যসাচীর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সেকি ? আপনার

চাল চলনে তো ঠিক এর উল্টোটাই মনে হয়। এরকম একটা আলোচনাই যেন আপনার কাম্য।

ইচ্ছে হলেও এধরনের কথা একজন মহিলার মুখের ওপর বলতে পারে না সব্যসাচী। তাই কোন জবাব না দিয়ে সে চুপ করে থাকে।

বন্দনা আবার বলতে থাকে, অবশ্যি এমনি কানাঘুসোর জন্যে আমি নিজেই দায়ী।

এতক্ষণে কথা বলে সব্যসাচী। জিজ্ঞেস করে, কেন বলুন তো ?

আবার হেসে ওঠে বন্দনা। সব্যসাচী লক্ষ্য করে বন্দনার এবারের হাসিটুকু কেমন যেন একটু ম্লান। একটা চাপা দুঃখবোধ যেন মিশে রয়েছে তাতে।

হাসি থামিয়ে একসময় গম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকে বন্দনা, একে তো পোশাক-আশাক আচার-আচারণে আমি বাস্তবিকই একটু আলট্রা মডার্ণ, তার ওপর গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার অভ্যেস আমার। এই অফিসে জয়েন করার পর থেকেই যে আপনাকে আমি একটু বিশেষ চোখে দেখছি এটাও কিছু মিথ্যে নয়। কাজেই এসব নিয়ে কানঘুসো হওয়াই তো স্বাভাবিক। না হলেই বরঞ্চ আশ্চর্য লাগতো।

বন্দনার কথায় সব্যসাচীর কৌতূহল বেড়ে ওঠে। নিজের সম্পর্কে এমন সচেতন এই মহিলা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এসব কথা বলছে ? কি চায় সে ?

ইণ্টালী মার্কেটের পাশের রাস্তা ধরে একটা পুরানো দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা। সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, এখানেই বুঝি আপনি থাকেন ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বন্দনা বললে, হ্যাঁ, দোতলায় দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

ভ্রু-কুঁচকে বন্দনার দিকে তাকায় সব্যসাচী। কন্ঠে মিনতির সুর ফুটিয়ে বন্দনা বললে, ডালহৌসী থেকে সোজা বাড়ি না গিয়ে এতদূর ঘুরে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। যদি আমাকে আর মাত্র পাঁচটি মিনিট দয়া করে সময় দেন তো খুব খুশি হবো।

—বেশ তো, আর একটু সময় না হয় অপেক্ষা করছি। আপনি কি এই গাড়িতে চেপে অন্য কোথাও যেতে চান ?

—না—না, সেজন্যে নয়, বলে ওঠে বন্দনা, আর মাত্র পাঁচটি মিনিট আপনাকে আটকে রাখবো আমি, আমার এখান থেকে এক কাপ চা খেয়ে যেতে হবে আপনাকে।

—সেকি, বিস্মিত কন্ঠস্বর সব্যসাচীর, অফিসের পরে বাড়ি ফিরছি, এখন আবার—

সব্যসাচী কথাটা শেষ করার আগেই বন্দনা আবার বলে ওঠে, আমার অনুরোধ—মিনতি, মাত্র পাঁচ মিনিট। একটুও বেশি নয়। মাত্র এক কাপ চা।

অগত্যা গাড়ি থেকে নামতে হয় সব্যসাচীকে। সেই মুহূর্তে সে বন্দনার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতাটুকু অনুভব করতে পারে সহজেই।

সাজানো-গোছানো ছিমছাম একখানি ঘর। প্রাচুর্যের বাহুল্যও যেমন নেই, তেমনি নেই দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন। অফিসে মাইনেপত্র ভালই পায় বন্দনা। তাই তার সংসার তরণী তর তর করে না চললেও ধাক্কা খেতে খেতে চলে না।

সব্যসাচীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে যায় বন্দনা। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে এসে সব্যসাচীর মুখোমুখি বসে হেসে বললে, চায়ের ব্যবস্থা করে এলাম।

বন্দনা যতক্ষণ ঘরে ছিল না ততক্ষণ সব্যসাচী ঘরের আসবাবপত্র দেখছিল। রুচির ছাপ্ চারিদিকেই। কিন্তু পুরুষের ব্যবহৃত কোন বস্তুই এই সময়টুকুর মধ্যে চোখে পড়লো না তার। তবে কি বন্দনা এখানে একা থাকে? কোন আত্মীয়-পরিজন নেই নাকি তার?

বন্দনা ফিরে এসে বসতেই সব্যসাচী সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তাকে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বন্দনা, আচ্ছা বলুন তো, আমার বয়স কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা। কিন্তু কেউ যদি নিজে থেকে সেই প্রসঙ্গ তোলে তা'হলে কিছু না বলাটা আরও অভদ্রতা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সব্যসাচী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না হঠাৎ বন্দনা নিজের বয়সের প্রসঙ্গ তুললো কেন। আজ প্রথম থেকেই বন্দনার কথাবার্তা কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগছিল তার কাছে। কি ওর উদ্দেশ্য? কেনই বা তাকে এমনিভাবে চা খেতে ডেকে এনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজের বয়সের কথা তুলছে? একটু আগে গাড়িতে আসতে আসতে বন্দনা নিজের মুখেই তো স্বীকার করেছে যে সব্যসাচীর ওপর অনেকদিন থেকেই তার একটু বিশেষ নজর আছে। কেবল বন্দনা কেন, সব্যসাচী জানে অফিসের আরও কয়েকটি মেয়ের নজরও রয়েছে তার ওপর। তারা হয়তো তা' স্বীকার করে না, কিন্তু বন্দনা তা' স্বীকার করেছে। অন্যের মত নিজের মনের কথা চেপে না রেখে আজ সুযোগ পেয়ে নিজের মুখে কথাটা যে সে স্বীকার করেছে এতেই তার স্পষ্টবাদীতা প্রকাশ পায়। হয়তো বা আলট্রা মডার্ণ মহিলাদের এটাই ধারা। কিন্তু নিজের বয়সের প্রসঙ্গ তোলাটাই আশ্চর্য। এই একটি ব্যাপারে বিশ্বের তাবৎ মহিলা সমাজ এক—ইউনিভার্সাল। নিজের বয়সের প্রসঙ্গ পরিহার করাটাই রীতি।

বন্দনার প্রশ্নে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তা করে সব্যসাচী, তারপর হেসে জবাব দেয়, মানুষ তো ছাড়, স্বয়ং দেবতারাও মেয়েদের বয়সের খবর বলতে পারেন না। তাঁরা সর্বজ্ঞ হয়েও এই একটি ব্যাপারে দারুণ অজ্ঞ। তাই বোধহয় স্বর্গের অপ্সরীরা সমগ্র দেবকুলের কাছে চিরদিনই যুবতী।

সব্যসাচীর কথায় বন্দনা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, অপ্সরীদের তো ঐটুকুই কেবল মূলধন। নইলে তো তাদের দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হতো।

বন্দনার কথা শেষ হতেই চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে ঘরে ঢোকে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। বয়স বড়জোর কুড়ি-একুশ। মেয়েটি ব্রীড়া সংকুচিত ভঙ্গিতে চায়ের ট্রে বন্দনার সামনে ছোট টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই বন্দনা বলে ওঠে, ওকি, যাচ্ছিস্ কোথায়? আমার কাছে এসে বোস্।

থমকে দাঁড়ায় মেয়েটি। মাথা নীচু করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায় বন্দনার দিকে। তারপর মৃদু কন্ঠে বললে, না, আমি যাই।

মেয়েটি আর দাঁড়ায় না সেখানে। পালিয়ে বাঁচার মত ত্রস্ত পায়ে সেখান থেকে সে চলে যেতেই বন্দনা সেই দিকে তাকিয়ে সস্নেহ কন্ঠে কেবল উচ্চারণ করে, পাগলী!

মেয়েটির চাল-চলনে সব্যসাচী বুঝতে পেরেছিল যে তাকে দেখেই লজ্জায় সে পালিয়েছে। মেয়েটি বোধহয় বন্দনার বোন কিম্বা ঐ ধরনের কেউ হবে। পরিচয় জানার জন্যে আগ্রহ থাকলেও বন্দনাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারছিল না সে। একটি অপরিচিত যুবতী সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো অভদ্রতা।

সব্যসাচী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিল বন্দনা নিজেই বোধহয় ঐ মেয়েটির পরিচয় দেবে। কিন্তু তার বদলে বন্দনা তার নিজের আগের কথার জের টেনে আবার বললে, কই, আমার বয়স সম্পর্কে কিছু বললেন না তো!

আবার সেই বয়সের কথা। সব্যসাচী বুঝতে পারে না বন্দনা কেন বারে বারে নিজের বয়সের প্রসঙ্গ তুলছে। তবে কি বন্দনা নিজে যে সব্যসাচীর চাইতে বয়সে ছোট এই কথাটাই তাকে জানাতে চায়? কিন্তু সে চাইলেই তো সব্যসাচী তা' বিশ্বাস করতে পারে না। মেয়েদের মুখের মেক্আপ আর যা কিছুই চুরি করতে পারুক না কেন পুকুর চুরি করতে পারে না কিছুতেই। বন্দনা যতই কেন না মেক্আপের আবরণে নিজেকে ঘিরে রাখুক, সব্যসাচীর বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না যে বন্দনা বয়সে তার চাইতে খুব একটা ছোট নয়। এমনকি সমান সমানও হতে পারে।

বন্দনার কথার জবাবে সব্যসাচীর বলতে ইচ্ছে করছিল—যতই কেন না খুকী সেজে থাকুন আপনি, বয়স আপনার আমার চাইতে তেমন একটা কম নয়। কিন্তু

এ ধরনের কোন কথা একজন মহিলার মুখের ওপর বলা চলে না। কথাটা সত্যি হলেও নয়।

সব্যসাচীর দ্বিধার ভাবটুকু যেন ধরে ফেলে বন্দনা। নিজের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললে, বলতে পারলেন না তো! আমি জানতাম পারবেন না। শুধু আপনি কেন, আমাদের অফিসের কারুর পক্ষেই তা' সম্ভব নয়। তাই তো তারা বোকার মত আপনার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে নানারকম গবেষণা করে বেড়ায়।

সেই মুহূর্তে বন্দনার কথাগুলোকে হেঁয়ালী বলেই মনে হচ্ছিল সব্যসাচীর। কি সে বলতে চাইছে? কি তার বলার উদ্দেশ্য? প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে গিয়ে সব্যসাচী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ঐ মেয়েটি বুঝি আপনার বোন?

সব্যসাচীর কথায় কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ওঠে বন্দনা। হাসতে হাসতেই বললে, হ্যাঁ বাইরের লোকের পক্ষে রুনুকে আমার বোন বলে মনে করাই স্বাভাবিক। তবে ও আমার বোন নয়—মেয়ে।

প্রথমটায় বন্দনার কথাটাকে ঠাট্টা বলেই মনে করেছিল সব্যসাচী। কোন কোন দিদির কাছে ছোট বোন মেয়েরই মত। তাই সে বললে, ওকে বুঝি আপনিই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন?

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় বন্দনা, নিজের মেয়েকে মা ছাড়া আর কে কোলেপিঠে করে মানুষ করবে?

বন্দনার কথায় সব্যসাচীর বিস্ময় একটু একটু করে বাড়ছিল বলে কি বন্দনা? মিস্ বন্দনা আচার্যের মেয়ে রুনু? তবে কি এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে কোন বিয়োগান্ত নাটকের উপাদান?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে বন্দনা মুখের হাসিটি মিলিয়ে যায় তার। একটা বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে সেই মুখে। মৃদু কন্ঠে সে বলতে থাকে, জানেন, অফিসে সবাই আমাকে জানে 'মিস্' বলে, কিন্তু আসলে আমি মিসেস। আমাকে দেখে আমার বয়স বোঝার উপায় নেই। তার ওপর সর্বদাই এমনভাবে থাকি যে আমার মেয়ের বয়স যে কুড়ি একুশ তা' কেউ কল্পনায়ও আনতে পারে না। আমার নিজের বয়স আটত্রিশ। সতেরো বছর বয়সে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। আঠারো বছরেই পেটে এলো রুনু। তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। বাবা মারা গেলেন। বছরখানেক যেতে না যেতেই মারা গেল রুনুর বাবা। সেই থেকে রুনুকে নিয়ে আমি একা—সম্পূর্ণ একা। মেয়ে মানুষ করার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও চালিয়ে গেলাম। চাকরির বাজারে গিয়ে দেখি বিধবার সেখানে স্থান নেই। তাই একদিন কুমারী সাজলাম। রুজ পাউডারের আড়ালে নিজের বয়সটাকে দিলাম কমিয়ে। আশ্চর্য রেজাল্ট, পেয়ে গেলাম চাকরি। একটা ছাড়লাম, আর একটা

ধরলাম। এমনিভাবেই একদিন এসে ঠেকলাম এই অফিসে। এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই ঐ রুনুকে কেন্দ্র করে। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, হায়ার সেকেণ্ডারীতে সেকেণ্ড হয়েছিল। ফিলজফি:ত অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে এখনই ওকে একটি ভালো পাত্রর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। এখন রাত-দিন কেবল ঐ চিন্তাই করি। সেই চোখ নিয়েই আজকাল আমি ছেলেদের দিকে তাকাই। অনেকে এর ভিন্ন অর্থ করে, আর আমি কেবল মনে মনে হাসি। কুমারী বন্দনা আচার্যের পরিচয়ে কেমন করে আমি তাদের ভুল ভেঙে দিয়ে বলতে পারি যে আমি আমার মেয়ের জন্যে একটি ভালো পত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি?

বিস্মিত সব্যসাচী এতক্ষণ একদৃষ্টে বন্দনাব দিকে তাকিয়ে তার কাহিনী শুনছিল। এতক্ষণে যেন হেঁয়ালীর অবসান ঘটেছে। বন্দনার আচার-আচরণের একটা অর্থ যেন খুঁজে পেয়েছে সে। তা'হলে কি নিজেব মেয়ে ঐ রুনুর জন্যে বন্দনা তাকেই মনোনীত কবেছে? তাই কি আজ তাকে বাড়িতে ডেকে এনে কৌশলে রুনুকে দেখিয়ে দিলে? মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। লেখাপড়ায়ও চমৎকার। হায়ার সেকেণ্ডারীতে সেকেণ্ড হওয়া কি চাট্টিখানি কথা! কাজেই পাত্রী হিসেবে সে অবশ্যই চমৎকার। কিন্তু তাই বলে সব্যসাচীর পক্ষে তাকে বিয়ে করার কোন প্রশ্নই এখন ওঠে না। তার বাবা-মা'র পাত্রী বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে। তাঁদের মনোনীত পাত্রীকেই সে বিয়ে করবে। কথাবার্তা পাকা। কাজেই শেষপর্যন্ত বন্দনাকে নিরাশ হতেই হবে। কোন কৌশলই তার খাটবে না। নিজের বিয়ের কথাটা যেদিন সে অফিসে প্রকাশ করবে সেদিন বন্দনা হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু কোন উপায় নেই।

বন্দনার ওখান থেকে ফিরে আসার সময় বন্দনা যেন ইচ্ছে করেই নিজের মেয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিল। বলেছিল, এমন লক্ষ্মী মেয়ে একালে প্রায় চোখে পড়ে না। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, তবে ও যার ঘরে যাবে সেই ঘর সত্যিই ও আলো করবে।

কথাটা শেষ করেই বন্দনা এমনভাবে সব্যসাচীব মুখের দিকে তাকিয়েছিল যেন রুনুর প্রসঙ্গে সে তার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিরাশ হতেই হলো তাকে। সব্যসাচী কেবল ভদ্রতার খাতিরে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। পরক্ষণেই অফিসেব প্রসঙ্গ টেনে এনে দু'চারটা কথা বলে বিদায় নিয়েছিল সেখান থেকে।

(চার)

কথায় বলে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। সব্যসাচী মেয়ে নয়। কাজেই বন্দনার বিষয় নিয়ে সে অফিসের কারুর সঙ্গেই আলোচনা করেনি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, বন্দনা যে কুমারী নয়, বিধবা এবং তার যে একটি বিয়ের যোগ্যা মেয়ে আছে একথা অফিসে প্রচার করার অর্থই হলো অফিস স্টাফদের মধ্যে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সুযোগ দেওয়া। আর সেই জল্পনার মধ্যে তাকেও জড়িয়ে হয়তো একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে। তার চাইতে মুখে কুলুপ এঁটে থাকাই ভালো।

কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে? গাড়ির ড্রাইভার পরের দিন অফিসে এসেই প্রচার করে দিলে যে সব্যসাচী বন্দনা দিদিমনিকে পেঁছে দিতে তার বাড়ি গিয়েছিল। খবরটা প্রচার হতেই অফিস স্টাফদের মধ্যে শুরু হলো মুখ টেপাটেপি। মেয়েদের মধ্যে আরম্ভ হলো ফিসফিসানি। দিন কয়েক পরে সব্যসাচীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জিজ্ঞেস করেই বসলে, কিহে, আজকাল নাকি মিস আচার্যের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু করেছো?

—কে বললে? জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

—যেই বলুক না কেন, কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়?

সেই মুহূর্তে এমন একটা সত্যি কথাকে সরাসরি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে না সব্যসাচী। বললে, হ্যাঁ, অনুরোধ এড়াতে পারিনি বলেই সেদিন ওঁকে পেঁছে দিতে গিয়েছিলাম।

বন্ধু একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বললে, খুব সাবধান, ওসব ঘোড়েল মেয়েদের পাল্লায় পড়লে আর কিন্তু রক্ষে নেই। এই ধরনের মেয়েরা একবার ঘাড়ে চড়ে বসলে কিন্তু সিন্দবাদ নাবিকের মত কিছুতেই আর নামতে চাইবে না।

বন্ধুর কথায় সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর বলতে ইচ্ছে করছিল—না হে, যা ভাবছো তা নয়। বন্দনার নিজের ঘাড়ে চাপার কোন ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। তবে তার কন্যাটিকে বোধহয় আমার ঘাড়ে চাপাতে পারলেই সে খুশি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না বলে সে কেবল মৃদু হেসে চুপ করে রইলো।

সব্যসাচীকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধুটি মুচকি হেসে আবার বললে, কিহে, চুপ করে থেকে কি ভাবছো ? বেশিদূর এগিয়েছ নাকি ?

বন্ধুর কথার খোঁচাটুকু হজম করতে না পেরে সব্যসাচী গম্ভীর সুরে বললে, না—না, এগোনো-পেছোনোর কোন ব্যাপারই নেই এর মধ্যে। রজ্জুতে সর্প ভ্রম করছো। তা ছাড়া আমার বিয়ে প্রায় পাকা। তারিখও ঠিক হয়ে গেছে।

—তাই নাকি ? এত বড় একটা খবর আমাদের কাছে চেপে রেখেছ কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে, বলো তো ?

জবাবে সব্যসাচী বললে, না, চাপি নি। ভেবেছিলাম বিয়ের চিঠি হাতে ধরিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমকে দেব।

—বেশ —বেশ, হাসিমুখে বলতে থাকে বন্ধুটি, শুভদিনটি কবে ?

সব্যসাচী তারিখটি বলতেই বন্ধুটি বলে ওঠে, এখনও তো ঢের দেরি। তা বাপু, দেরি থাক্ বা না থাক্, এমন জবর খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের মেয়ে মহলে যে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়বে তার ঝাপটায় তুমি শেষ পর্যন্ত উড়ে না গেলেই বাঁচি। এই খবরের ধাক্কায় এখানকার কত যুবতীর কল্পনার জগৎ যে ভেঙে পড়বে তার ঠিক কি! আমার তো মনে হয় মিস্ আচার্য টানা মাস তিনেকের ছুটি নেবেন। কথাটা শেষ করেই বন্ধুটি হো—হো করে হেসে ওঠে।

সেই মুহূর্তে বন্ধুর হাসিতে কিন্তু যোগ দিতে পারে না সব্যসাচী। বন্দনার কাহিনী সেদিন বাস্তবিকই রেখাপাত করেছিল তার সংবেদনশীল মনে। জগতের প্রতিটি মা-ই নিজের কন্যার জন্যে একটি ভালো পাত্র খুঁজে বেড়ায়। এটাই স্বাভাবিক। বন্দনা নিজেও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই আশাতেই সে এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব্যসাচীর পিছু পিছু। কাজেই তার বিয়ের খবরে বন্দনা আচার্য যে দুঃখিত হবে এবং তার সেই দুঃখবোধকে ঘিরে সারা অফিসে যে কৌতুকের বান ডাকবে একথা চিন্তা করেই বন্দনার জন্যে তার মনটা সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সব্যসাচী তার বন্ধুকে যতই কেন না বারণ করে দিক, খবরটা ছড়িয়ে পড়তে কিন্তু বেশি সময় লাগলো না। অফিসার মহল তো বটেই, ক্ল্যারিক্যাল স্টাফ্দের মধ্যেও অনেকে দেখা হলেই কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে বসে তাকে। বলে, এটা হচ্ছে গিয়ে আগাম অভিনন্দন। বিয়ের পরে আর একবার হবে।

জবাব না দিয়ে সব্যসাচী কেবল মৃদু হাসে। বন্ধুরা যা-ই বলুক না কেন, তার বিয়ের খবরে অফিসের মেয়েদের মধ্যে কিন্তু তেমন কোন চাঞ্চল্য চোখে পড়ে না সব্যসাচীর। তারা কিন্তু আগের মতই কথা বলে তার সঙ্গে, জিজ্ঞেস করে পাত্রীর পরিচয়, মিষ্টি হেসে জবাব দেয় তার প্রশ্নের। দু' একজন ঠিক ছেলেদের

মত আগাম অভিনন্দনও জানায়। তবে বন্দনার চাল-চলনে বেশ আশ্চর্য বোধ করে সব্যসাচী। সে যেন ইদানীং তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

একদিন টিফিনের সময় অফিসের লম্বা করিডোরে বন্দনার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় সব্যসাচীর। বন্দনার বদলে সব্যসাচী নিজেই সেদিন ডাকে তাকে, এই যে মিস্ আচার্য, আজকাল যে আর আপনাকে দেখতে পাই না?

সব্যসাচীর কাছে এগিযে আসে বন্দনা। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে ঠাট্টার সুরে সে জবাব দেয়, পাবেন কি করে? ভাবী বধূর মুখখানাই যে এখন আপনার চোখের সামনে দিবারাত্র ভাসছে।

সব্যসাচী সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। এটা বন্দনার নির্জলা ঠাট্টা কিম্বা এর পেছনে আরও কিছু আছে, তা' বুঝতে না পেরে সে হাসিমুখে কেবল চুপ করে থাকে।

বন্দনা সব্যসাচীর আরও একটু কাছে সরে এসে নীচু কণ্ঠে বললে, আপনার বিয়ের খবরে খুশি হয়েছি, মিঃ বোস। তার চাইতেও বেশি খুশি হয়েছি আর একটা ব্যাপারে।

—কি ব্যাপার বলুন তো? কৌতূহলী চোখে সব্যসাচী তাকায় বন্দনার দিকে।

সহসা বন্দনার মুখখানা একটু ম্লান হয়ে ওঠে। সেই ম্লান মুখে সামান্য হাসি ফুটিযে তুলতে চেষ্টা করে মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, আমার সব কথা আপনাকে বলেছি। তা' সত্ত্বেও আমি যে এখনও এই অফিসে 'মিস্' হয়ে আছি সেই জন্যেই আমি আপনাব কাছে কৃতজ্ঞ।

সব্যসাচী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, এ আর এমন কী ব্যাপার! আপনার প্রাইভেট কথা আমি পাঁচকান করতে যাবো কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার কাছ থেকে আপনাব কথা ভবিষ্যতে কখনও প্রকাশ হয়ে পড়বে না।

সেদিন সব্যসাচী জোর গলায বন্দনাকে আশ্বাস দিলেও হঠাৎ একদিন কেমন করে যেন কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। সাবা অফিস জুড়ে একটা চাপা আলোড়ন —কী সাংঘাতিক মহিলা! বিয়ের যোগ্যা একটা মেয়ে থাকতে নিজেকে দিব্বি প্রজাপতি বানিয়ে কুমারী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আরে বাপু, গভীর জলের মাছ। বাগে পেলে অসহায় জেলেকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে জলের তলায়।

কথাটা কানে উঠতেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে সব্যসাচী। কথাটা জানাজানি হলো কেমন করে? সে নিজে তো কখনও কাউকে একথা বলে নি। কিন্তু বন্দনা নিজে হয়তো একথা বিশ্বাস করবে না। সে নিশ্চয়ই ধরে নেবে

সব্যসাচীই এটা অফিসে প্রচার করে দিয়েছে তার পক্ষে এমন একটা ধারণাই স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্য তার, বিনাদোষে ঐ মহিলার কাছে তাকে দোষী হতে হলো। নিজে গিয়ে বন্দনাকে বললেও কি এখন সে তার কথা বিশ্বাস করবে।

বিষয়টি নিয়ে নিজের মনেই দু চার দিন নাড়াচাড়া করলো সব্যসাচী। অবশেষে একদিন সে ঠিক করলে, বন্দনার কাছে গিয়ে ব্যাপারটার ফয়সলা করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে এই খবরের সূত্র সে নিজে নয়। বন্দনা নিশ্চয়ই তার কথা অবিশ্বাস করতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না সব্যসাচী। একদিন প্রস্তুত হয়ে সে বন্দনার টেবিলের কাছে এসে দেখে যে তার চেয়ার খালি। সব্যসাচীকে ইতঃস্তত করতে দেখে বন্দনার পাশের টেবিলের মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবেন নাকি, মিঃ বোস ?

ইতঃস্তত ভাবটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, মিস্ আচার্য আজ অফিসে আসেন নি ?

সব্যসাচীর কথায় মেয়েটির মুখের ওপর দিয়ে একটুকরো হাসি ঢেউ খেলে চলে যায়। পরক্ষণেই সে জবাব দেয়, না আসেন নি। গতকালও তিনি এ্যাবসেন্ট ছিলেন। মনে হয়, হঠাৎ আমাদের কাছে তিনি 'মিসেস্' হয়ে উঠছেন বলেই হয়তো লজ্জায় আর আসছেন না। এস্টাবলিশমেণ্ট সেকসনে শুনলাম উনি নাকি একমাসের ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছেন।

কথাটা শেষ করেই মেয়েটি এমনভাবে সব্যসাচীর দিকে তাকায় যেন সে সব্যসাচীর কাছ থেকে এসম্পর্কে কিছু মন্তব্য আশা করছে। সব্যসাচী কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে নিরাশ করে জবাব দেয়, ও—তাই নাকি ? বলেই আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে চলে আসে।

বন্দনার কাছে নিজের দোষ স্খালনের আর সুযোগ পেল না সব্যসাচী। একবার তার মনে হয়েছিল বন্দনার বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে মনে করে সব্যসাচী নিরস্ত করে নিজেকে। যাকগে, আগ বাড়িয়ে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে না যাওয়াই ভালো।

সেদিন সব্যসাচী অফিস ফেরৎ বাড়ি ফিরেই টের পায় যে তার ছোট জামাইবাবু সুদীপ এসেছেন। সুদীপ থাকেন বৌবাজার অঞ্চলে। লোহালক্কড়ের ব্যবসা তাঁর। তিন পুরুষের ব্যবসা। তা'ছাড়া, কলকাতায় খান চারেক বাড়ির মালিক তিনি। সাধারণতঃ ঝানু ব্যবসাদারদের ভাবনা-চিন্তা যেমন ব্যবসা সংক্রান্ত খাত ছাড়া অন্য কোন খাতে বয়ে চলে না, সুদীপের কিন্তু তা' নয়। ভয়ংকর স্ফূর্তিবাজ মানুষ তিনি। মাঝারি বয়স। আদ্দির পাঞ্জাবী ও ফিনলে কোম্পানীর ধুতি

ছাড়া অন্য কিছু তিনি পরেন না। পায়ে থাকে চকচকে পাম্পস্‌। পোশাকের মত মনটাও তার সৌখীন। এই বেশেই তিনি নিজের ধবধবে সাদা গাড়িখানা নিজেই ড্রাইভ করেন। কেউ ড্রাইভার রাখার কথা বললেই তিনি হেসে হালকা সুরে জবাব দেন, বাইরের একটা লোকের ওপর নিজের জীবনের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার মত বোকা আমি নই। তাই নিজের বোঝা নিজেই বয়ে নিয়ে বেড়াই।

সুদীপ তাঁর এই একমাত্র শ্যালকটিকে খুবই ভালোবাসেন। বাড়িশুদ্ধ সবাই যেখানে সব্যসাচীকে 'খোকা' বলে ডাকে, সেখানে সুদীপ তাকে ডাকেন 'অসভ্য' বলে। 'সব্য' থেকে 'সভ্য', আবার তা' থেকে 'অসভ্য'। মাঝে মধ্যে সব্যসাচীকে ঠাট্টা করেন তিনি। বলেন, জানো ভাই অসভ্য, ঈশ্বর তোমাকে মেয়ে না বানিয়ে ছেলে বানিয়েছেন বলে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কেন জামাইবাবু? জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী, আমি ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে আপনার কি অসুবিধে হতো?

—বারে, অসুবিধে হতো না? বলতে থাকেন সুদীপ, তুমি মেয়ে হলে আমার একটা শালীর সংখ্যা অবশ্যই বাড়তো, কিন্তু শালা পেতাম না। আর, শালা ছাড়া ভগ্নিপতির জীবনটাই তো বৃথা।

—কেন, বৃথা কেন? কৌতুক কণ্ঠে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে।

জবাবে সুদীপ বলেন, ঐ একটিমাত্র লোককেই তো প্রাণখুলে শালা বলে সম্বোধন করা চলে। শালা শব্দটি যতই কেন না ইউনিভার্সাল হোক, অন্য কেউ নিশ্চয়ই এটা পছন্দ করবে না। কিন্তু শালা বেচারীর উপায় নেই। তাকে সহ্য করতেই হবে।

ডাঃ সর্বেশ্বর বোস ব্যস্ত মানুষ। ছেলের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তেমন করে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁর। পাত্রী পছন্দ করেছেন তিনি। ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত। বিয়ের বাকি ঝক্কি ঝামেলা সহ্য করবার মত অবসর তাঁর নেই। কাজেই শেষপর্যন্ত সেই দায়িত্ব এসে চেপেছে সুদীপের ঘাড়ে। সুদীপও হাসিমুখে নিজের কাঁধে নিয়েছেন সেই দায়িত্ব। সব্যসাচীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র শালা। সেই শালার বিয়ের ব্যাপারে কি গানা লাগালে চলে?

সুদীপ ইদানীং মাঝে মাঝেই শ্বশুর বাড়ি আসেন বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে। ডাঃ বোসের সঙ্গে কথা বলার তেমন সুযোগ না পেলেও শাশুড়ি ঠাকুরণের সঙ্গেই আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় মাঝে মাঝে সব্যসাচীরও ডাক পড়ে। সুদীপ শালার পিঠে চাপড় মেরে বলেন, এসো-এসো অসভ্য। এযুগে কি আর লজ্জা করলে চলে? সে যুগে পাশের ঘরে বসে বিয়ের কথা হতো, আর পাত্র উদাসীন ভঙ্গিতে চোখের সামনে কবিতার বই মেলে ধরে এবং কানদুটো পাশের ঘরের কথাবার্তার দিকে খোলা রেখে কাব্যচর্চা করতো। সে

যুগ আর নেই। এখন তো খোদ্ পাত্রকেই এসে বিয়ের আলোচনায় যোগ দিতে হয়। এমনকি পাত্রীকে কি ধরনের শাড়ি-গয়নায় মানাবে তাও কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রকেই বলে দিতে হয়।

সন্দীপের কথায় সব্যসাচী হয়তো হেসে বলে, তা' কেমন করে হবে, জামাইবাবু? আমি তো পাত্রী দেখিনি।

জবাবে সন্দীপ বলেন, সবকিছুই কি নিজের চোখে দেখতে হয়? দেশের রাজা নাকি কান দিয়ে দেখেন। তোমার ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের কাছে শুনে শুনে পাত্রীর রূপ-গুণ তোমার তো মুখস্থ হবার কথা। আমার তো বিশ্বাস, তা' তোমার হয়েছে। আর, না হয়ে থাকলে নিজের চোখে একবার দেখে আসতে ক্ষতি কি? বল তো, আমি সেই ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তুমি একবার রাজি হলেই হয়।

সব্যসাচী হয়তো বলে, না জামাইবাবু, আমি তো আগেই বলে দিয়েছি যে আমি নিজে দেখবো না। আপনাদের পছন্দতেই আমার চলবে।

—শুভদৃষ্টির রোমান্সটাকে ফিকে করতে চাও না বুঝি? হেসে উঠে বলেন সন্দীপ।

জবাব দেয় সব্যসাচী, তা' আপনারা যা বলার বলুন। তবে পাত্রী দেখার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।

— ভালো— ভালো। গুরুজনদের ওপর এরকম বিশ্বাস থাকা খুবই ভালো। কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ওঠেন সন্দীপ। তারপর হালকা সুরে আবার বললেন, বিয়ের পরেই বুঝতে পারবে যে আমাদেরও টেস্ট্ আছে। তোমাকে মোটেই ঠকাইনি আমরা।

অফিসের জামা কাপড় ছেড়ে পাজামা-গেঞ্জি পরে নেয় সব্যসাচী। তারপর খাওয়ার টেবিলে জলখাবার খেতে খেতে একটা ইংরেজি মাসিকপত্রের ওপর চোখ বুলোতে থাকে।

শাশুড়ি ঠাকুরণের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে হঠাৎ ডাইনিং রুমে এসে হাজির হন সন্দীপ। সব্যসাচীকে দেখে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হৈ-হৈ করে ওঠেন তিনি, এই যে অসভ্য, কখন ফিরলে? আমি তো ভাবলাম তুমি বুঝি এখনও ফেরোনি।

শূন্য চায়ের কাপটা সামান্য ঠেলে দিয়ে সব্যসাচী হাসিমুখে তার ছোট-জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, এই তো কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি। তা, আপনি এই সময় এখানে? ব্যবসায়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন নাকি?

—প্রায় তেমনি অবস্থা, হেসে হেসে বলতে থাকেন সন্দীপ, আজ সারাদিনে ঘণ্টা-তিনেকের বেশি দোকানে থাকতে পারিনি। কর্মচারীরাই যা করবার করছে।

—কেন, কোথাও গিয়েছিলেন নাকি ?

সব্যসাচীর মুখোমুখি একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসতে বসতে সুদীপ বলতে থাকেন, আর বলো কেন, তোমার বিয়ের ব্যাপারেই একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। তা, কাজ কিছুই হলো না।

—আমার বিয়ের ব্যাপারে আবার কোথায় গিয়েছিলেন ? কিছু কেনাকাটা করতে নাকি ?

—আরে না—না, সেসব কিছু নয়। ওসব কেনাকাটার মধ্যে কিন্তু আমি নেই। তার জন্যে তো তোমার দিদি রয়েছে। আমি গিয়েছিলাম একটা এন্‌কোয়ারী করতে।

—এন্‌কোয়ারী! আমার বিয়ের ব্যাপারে এন্‌কোয়ারী! কোথায় ? সব্যসাচী কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সুদীপ জবাব দেয়, না—না, তোমার সম্পর্কে সেই এন্‌কোয়ারী নয়, তবে বিষয়টা তোমার ভাবী পত্নী সম্পর্কে।

সব্যসাচী আর কিছু না বলে কেবল চুপ্ করে থাকে। বলতে থাকেন সুদীপ, জানো অসভ্য, এই সব বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে যাঁর সক্রিয় হয়ে ওঠার কথা, তোমার সেই বাবা তো তাঁর হাসপাতাল নিয়েই আছেন। তাঁর সঙ্গে তো একবার দেখা করার সুযোগও পাচ্ছি না। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে গিয়েছিলাম পাত্রীর অফিসে।

—কেন, সেখানে কি ? সহসা সব্যসাচীর মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসতেই সে সতর্ক হয়ে ওঠে। ছোটজামাইবাবুকে প্রশ্ন করে নিজের কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক্ নয়। এই নিয়েই হয়তো তিনি ঠাট্টা বিদ্রুপে সব্যসাচীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন।

বলতে থাকেন সুদীপ, সোজা কথা তো নয়, আমার শালাবাবুর বিয়ে। পাত্রী অবশ্যি সকলেরই পছন্দ। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চিন্ত থাকা চলে। যা দিনকাল পড়েছে। কে কোথায় কি করে বসে আছে তার ঠিক্ কি ? বিশেষ করে অফিসে চাকরি করা মেয়ে।

বলব না বলব না করেও সব্যসাচীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে কথাটা, কেন অফিসে চাকরি করা মেয়েদের বুঝি আপনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না, জামাইবাবু ?

—না—না, তা' নয়, তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন সুদীপ, এ যুগে ঘর-বার সবই তো একাকার। স্কুলে যাও, কলেজে যাও সর্বত্রই সেই একই জিনিস দেখতে পাবে। তা'হলেও বলতে হবে অফিসে চাকরি করা মেয়েদের স্কোপ অনেক বেশি। তা'ছাড়া, সেখানে প্রলোভনও যথেষ্ট।

—স্কোপ যেমন বেশি তেমনি ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তিও তাদের বেশি, বলতে থাকে সব্যসাচী, অফিসে যে সব মেয়ে চাকরি করে তাদের অধিকাংশই নিজেদের সম্পর্কে সচেতন।

সব্যসাচী থামতেই সন্দীপ হেসে উঠে বলতে থাকেন, বাব্বাঃ, এর মধ্যেই এত। বিয়ের কথাবার্তা হতেই যে চাকরি করা মেয়েদের ডিফেন্ড করতে শুরু করলে। নিজে না দেখে স্রেফ পরের মুখে ঝাল খেয়েই এত টান! ব্রেভো ব্রাদার—ব্রেভো। এই তো চাই। বিয়ের পরে তোমার দিদিকে এমনিভাবে ডিফেন্ড করতে গিয়েই তো ফ্যামিলির অনেকের কাছ থেকে আমাকে কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিল। তবে তোমার তো আর আমার মত জয়েন্ট ফ্যামিলি নয়। কাজেই সেই ভয় তোমার নেই। কথাটা শেষ করেই হাসতে থাকেন সন্দীপ।

ছোট জামাইবাবুর কথায় একটু লজ্জিত বোধ ক'রে সব্যসাচী সেইমুহূর্তে। লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠবার চেষ্টায় প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তা, গিয়েছিলেন তাদের অফিসে?

জবাব দেন সন্দীপ, হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। না--না, অন্য কোন কারণে নয়। ভদ্র ফ্যামিলির মেয়ে, শিক্ষিতা। আমার তো মনে হয়, দেখতেও যেমন সুন্দরী মনটাও তার তেমনি সুন্দর। পাকা কথা যখন হয়েই গেছে তখন অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর করার কোন মানে হয় না। তবুও জাস্ট একটু খবর—অফিসের রেপুটেশন ইত্যাদির কথা জানতে গিয়েই গিয়েছিলাম সেখানে। কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না স্রেফ খালি হাতেই ফিরে আসতে হলো।

—ঐ অফিসে আপনার পরিচিত কেউ আছে নাকি? জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

মাথা নেড়ে জবাব দেন সন্দীপ, কেউ না—কেউ না। সেখানেই তো বিপদ। জানাশোনা কেউ নেই। এদিকে খবর নিতে হবে, তাও আবার গোপনে। কাজেই শেষ পর্যন্ত অফিসের খোদ সাহেবের কাছেই গিয়ে হাজির হলাম।

—পাত্রীকে এড়িয়ে তার সাহেবের কাছে গেলেন কেমন করে?

শ্যালকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলতে থাকেন সন্দীপ, তোমার এই জামাইবাবুকে কি এতই বোকা মনে করো, অসভ্য? পাত্রী অফিসের রিসেপ্শনিস্ট। তার মাধ্যমেই সাহেবের কাছে যেতে হয়। পাত্রীকে দেখতে তার বাড়িতে একাধিকবার আমি গিয়েছি। কাজেই সে আমাকে ভালই চেনে। এই রিস্ক ঘাড়ে করে কি আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

—তবে কি করলেন, কৌতূহলী সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে।

সন্দীপ জবাব দেন, টেলিফোনে মাঝে মাঝেই খবর নিতাম সাহেবের সঙ্গে

দেখা হবে কিনা। প্রতিবারেই টেলিফোন ধরতো ওদের রিসেপ্‌সনিস্ট। নিরাশ হয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিতাম। পাত্রীর উপস্থিতিতে তো সেখানে যাওয়া যায় না। কিন্তু পাত্রী একদিনও অফিস কামাই করে না। অবশেষে আজ দুপুরের দিকে টেলিফোন করতেই অন্য একজনের কন্ঠস্বর পেলাম। রিসেপ্‌সনিস্ট সবিতা ঘোষের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম যে অফিসের কি একটা জরুরী কাজে তাকে নাকি চেম্বার-অফ্‌-কমার্সের অফিসে যেতে হয়েছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? বলতে থাকেন সুদীপ, সাহেবের ঘরে খবর পাঠিয়ে বসে রইলাম রিসেপ্‌শন রুমে। রিসেপ্‌শনিস্টের চেয়ার বাস্তবিকই খালি। সাহেব তখন কন্‌ফারেন্স রুমে। সেই-মুহূর্তে আমার অবস্থাটা একবার অনুমান করো। সবিতা ঘোষ যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। এদিকে সাহেবের কন্‌ফারেন্সও শেষ হয় না। কি নিদারুণ অবস্থা আমার। গোপনে এনকোয়ারী করার যে এত ঝামেলা তা' কি আগে জানতাম ? এক সময় সেই রুমে একজন মহিলা ঢুকতেই এমন হক্‌চকিয়ে গেলাম যে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি একটা কিছু কৈফিয়ত দিয়ে ফেলেছিলাম আর কি। কিন্তু না, সবিতা নয়, অন্য একটি মেয়ে।

—শেষ পর্যন্ত দেখা হলো ?

—না, সবিতার সঙ্গে নয়। তবে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। শুনলাম অফিসের সেই ছোট সাহেবটির নাম নাকি সজল মিত্র। বয়স অল্প, কিন্তু রামগরুড়ের ছানার মতই গম্ভীর। হাসতে যেন জানেনই না।

সুদীপ মোটেই বাড়িয়ে বলেন নি। সজল মিত্রের মুখে হাসি দেখতে হলে ভাগ্যের দরকার হয়। কন্‌ফারেন্স থেকে নিজের কক্ষে ফিরে এসে সজল মিত্র সুদীপের চিরকুটের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকেই নিজের খাস বেয়ারা উড়িষ্যাবাসী পরমেশকে বললেন ভিজিটরকে ডেকে আনতে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সুদীপ। সজল মিত্র তাঁকে বসিয়ে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই সুদীপ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, একটা ব্যক্তিগত কাজে এসেছি আপনার কাছে।

—বলুন, সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা সজলের

অনুমতি পেয়েও কথাটা বলতে একটু ইতস্ততঃ করেন সুদীপ। তারপর একসময় কণ্ঠস্বরে দ্বিধা ফুটিয়ে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা।

তেমনি গম্ভীর সুরে সজল বললেন, মনে দ্বিধা নিয়ে কাউকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তেমন থাকলে জিজ্ঞেস করবেন না।

—না—না, তা' নয়। জিজ্ঞেস করতেই তো এসেছি। আপনার অফিসের এক কর্মীর বিয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর করার ইচ্ছে নিয়েই আপনার কাছে আসা। বিষয়টা মোস্ট্ কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল। বুঝতেই তো পারছেন, যার সম্পর্কে খোঁজ নিতে আসা তার কানে এসব কথা ওঠাটা ঠিক্ সমীচীন নয়।

বিয়ের কথায় সজল মিত্রের চোখে একটু কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। গম্ভীর সুরে তিনি বললেন, কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল কথা কন্‌ফিডেন্‌সিয়ালই থাকবে। সেটা কোন প্রশ্ন নয়। আসল কথা, এসব মেট্রিমোনিয়াল ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কতটুকু খবর আপনি পেতে পারবেন ?

—তা' বটে। জবাব দেন সুদীপ, তবে অফিসের রেপুটেশন ইত্যাদি সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবেন।

সজল মিত্র কোন জবাব না দিয়ে সুদীপের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকেন।

সুদীপ বললেন, আপনার অফিসের রিসেপ্‌শনিস্ট সবিতা ঘোষের সঙ্গে আমার শ্যালকের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা। মেয়েটি কেমন তা' জানতেই আপনার কাছে এসেছি।

সজল মিত্র একটু সময় চুপ করে থাকেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর সুরে বললেন, আমার অফিসের কর্মীকে কি আমি কখনও খারাপ বলবো ?

—তা তো বটেই। আমি কেবল জানতে চাইছি অফিসে তার রেপুটেশন কেমন।

—ভালো। সবিতা ঘোষ একজন ভালো কর্মী। কাজকর্মে তুখোড়। এর বেশি তো তার সম্পর্কে আমি জানি না।

—হ্যাঁ, তাই স্বাভাবিক। আপনি তার অফিস বস্। এর বেশি আপনি আর কি বলতে পারেন ?

সজল মিত্র জিজ্ঞেস করেন, আপনার শ্যালকটি কি করে ?

—ইঞ্জিনীয়ার—বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার। কলকাতায় একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত আছে। পি. জি. হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর এস. বোসের নাম হয়তো শুনে থাকতে পারেন। পাত্র তারই একমাত্র ছেলে।

তাঁদের আলোচনার মধ্যে ছোট সাহেবের খাস বেয়ারা পরমেশ দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢোকে। সুদীপ চুপ্ করেন। অফিসের বেয়ারার সামনে এধরনের আলোচনা করা ঠিক্ নয়। তবে তার সেইমুহূর্তে মনে হলো তাঁর শেষের কথাটা বোধহয় ঐ

লোকটা শুনতে পেয়েছে। যাক গে। করার কিছু নেই। এখন সবিতার কানে এই খোঁজ-খবরের কথাটা না উঠলেই তিনি বাঁচেন।

পরমেশ চলে যেতেই সুদীপ আবার বললেন, তা'হলে আপনার অফিসে মেয়েটির যথেষ্টই সুনাম আছে।

জবাব দেন সজল, হ্যাঁ। কর্মী হিসেবে ভালই।

একমুহূর্ত ইতঃস্তত করেন সুদীপ। তারপর বলেই ফেললেন, মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে—

সুদীপের কথা শেষ হবার আগেই সজল গম্ভীর কণ্ঠে তাঁর অসম্পূর্ণ কথাটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে বললেন, কখনও কোন অভিযোগ আমার কানে আসে নি।

সুদীপ বুঝতে পারেন অফিসের এই সাহেবটির কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু জানা যাবে না। তাঁর ইচ্ছে ছিল সবিতার কথা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়েই সবিতার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সুদীপ একটা মোটামুটি ধারণা করে নেবেন। কিন্তু সজল মিত্র সে পথে গেলেনই না। সুদীপের প্রশ্নের জবাব ছাড়া আর একটিও বাড়তি কথা বললেন না তিনি। কাজেই শেষ পর্যন্ত একরকম হতাশ হয়েই তাঁকে ফিরে আসতে হলো।

সুদীপ থামতেই সব্যসাচী হেসে বলে ওঠে, তা'হলে জামাইবাবু, আপনার গোয়েন্দাগিরিটা একদম মাঠে মারা গেল, কি বলেন ?

—তা' যা বলেছ, অসভ্য। মাঠেই মারা গেল বলতে হবে। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। মেয়েটি সম্পর্কে আরও দু'একটা সোর্স থেকে আমি আগেই খবর জোগাড় করেছি। মেয়েটি বাস্তবিকই ভালো। তবে দেখলাম বটে এক সাহেব ! মার্চেণ্ট অফিসের সাহেবগুলো বোধহয় এমনিই রসকষহীন হয়ে থাকে। অফিসের একজন স্টাফের বিয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েছি। সাধারণ কৌতূহলটুকুও লক্ষ্য করলাম না তার কথা-বার্তায়। কেমন যেন একটা মেক্যানিকেল ভাব।'

হঠাৎ সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, কি নাম যেন বললেন সাহেবটির ?

—এস. মিত্র—সজল মিত্র। জবাব দেন সুদীপ।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে সব্যসাচী। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, কেমন দেখতে বলুন তো ?

জবাবে সুদীপ বললেন, পঁয়ত্রিশ ছ'ত্রিশের মত বয়স। ফর্সা মাঝারি চেহারা। দেখতে শুনতে ভালই—

সুদীপের কথার মাঝেই সব্যসাচী বলে ওঠে, মাথার মাঝখানে সিঁথি ? বাঁ গালে একটা বড় গোল দাগ ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলে ওঠেন সুদীপ, তুমি চেন নাকি তাকে ?

জবাব দেয় সব্যসাচী, খুব চিনি—ভালোভাবেই চিনি। বিলেতেই আলাপ হয়েছিল। ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল খানিকটা। আমার চাইতে পাঁচ ছ' বছরের সিনিয়র।

—ইঞ্জিনীয়ার নাকি ?

—না—না, সজলদা বিলেত গিয়েছিল লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করতে। ফিরে এলো বিজনেস ম্যানেজমেন্টের দামী ডিগ্রি নিয়ে। কি যেন তখন আপনি বললেন ? রামগরুড়ের ছানার মত সজলদা হাসতে জানে না, তাই না জামাইবাবু ? ঠিকই বলেছেন আপনি। বাইরে থেকে তা-ই মনে হয়। কেমন যেন রসকষহীন কাঠখোট্টা ধরনের। দু'চার দিন মেলামেশা না করলে তাকে ঠিক চেনা যায় না। শক্ত নারকেলের মত তার বাইরেটাই কেবল কঠিন, কিন্তু ভেতরের শাঁস খুবই নরম।

—এই বুঝি নরম শাঁসের নমুনা ? মুখে হাসি নেই, মনে কৌতূহল নেই, সাধারণ কোন কথাবার্তাও বললেন না আমার সঙ্গে। আমার প্রশ্নের জবাবে অতি সংক্ষেপে কেবল দু'একটা কথা উচ্চারণ করলেন। কফি খাওয়ালেন। তারপর সোজা বিদায় দিলেন। এই যদি নরম শাঁসের নমুনা হয় তা'হলে শক্ত শাঁস আর কাকে বলে !

সবিতার অফিসের ছোটসাহেবের সঙ্গে কথা বলে সুদীপ যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তা-ই প্রকাশ পাচ্ছিল তার কথায়। জামাইবাবুর বিরক্তির কারণ বুঝতে পেরে সব্যসাচী হেসে আবার বললে, আপনি দেখছি আমাদের সজলদার ওপর খুবই রেগে উঠেছেন, জামাইবাবু।

সুদীপ জবাব দেন, রাগবো না তো খুশি হবো নাকি ? তারপর একটু থেমে আবার বললেন, তা' বাপু, তুমি তো তোমার সজলদা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট দিচ্ছ। বিলেতে তোমার সঙ্গে নাকি তার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তা'হলে তুমিই একবার যাও না তার কাছে।

—আমি যাবো ? বিস্মিত কণ্ঠে বলতে থাকে সব্যসাচী, আমি গিয়ে বুঝি বলবো যে আমি তার অফিসের একজন কর্মীকে বিয়ে করতে চলেছি। কাজেই তার সম্পর্কে খবরাখবর চাই, কেমন ?

—না—না, তা' কেন ? বলে ওঠেন সুদীপ, তুমি জাস্ট্ একবার দেখা করতে যাবে তার সঙ্গে। তারপর কথায় কথায় একবার প্রসঙ্গটা তুলবে। তোমার সঙ্গে যখন এককালে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল তখন পাত্রী সম্পর্কে তিনি যদি কিছু জানেন তো নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন। ব্যাস্, পারপাস সার্ভ্ড। তা'ছাড়া—

কথাটা শেষ না করেই একটু মুচকি হেসে থেমে যান তিনি। সুদীপের মুখে সেই হাসিটুকু লক্ষ্য করে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, তা'ছাড়া কি, জামাইবাবু ?

তেমনি হেসে জবাব দেন সন্দীপ, তা'ছাড়া, রথ দেখা কলা বেচা দুটোই একসঙ্গে হয়ে যাবে। তোমার সজলদার সঙ্গে দেখাও হবে, আর ভাবী বধূর সঙ্গে ফার্স্ট রাউণ্ডের মোলাকাতটাও সেরে আসতে পারবে। রিসেপশনিস্টকে ডিঙ্গিয়ে এই অফিসের সাহেবদের সঙ্গে দেখা করা একেবারেই সম্ভব নয়।

—পাগল নাকি? সন্দীপের কথাটাকে হেসে একরকম উড়িয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সব্যসাচী। উঠে দাঁড়ান সন্দীপও। সব্যসাচী হেসে বললে, ফার্স্ট রাউণ্ড হোক কি সেকেণ্ড রাউণ্ড হোক, এইমুহূর্তে কোন রাউণ্ডের মোলাকাতেরই তেমন কোন প্রয়োজন নেই আমার।

নিরাশ ভঙ্গিতে শ্যালকের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকেন সন্দীপ। বলতে থাকে সব্যসাচী, তা'ছাড়া, এ সবে যে কি হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। পাকা কথা যখন হয়েই গেছে তখন এই স্টেজে এধরনের গোয়েন্দাগিরির কোন অর্থ আছে বলে তো মনে হয় না, জামাইবাবু।

—তা' অবশ্যি ঠিক, জবাব দেন সন্দীপ, তবে এটাকে কেবলমাত্র গোয়েন্দাগিরি বলতে পারো না। গোয়েন্দারা করেন রহস্যের সমাধান। আর আমি কেবল পাত্রীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিতে চাইছি।

(পাঁচ)

বাসন্তী যা আশঙ্কা করেছিলেন তা ই ঘটলো শেষপর্যন্ত। সবিতার বিয়ের খবর কেমন করে যেন কাতুপিসির কানে উঠলো। আসল নাম কাত্যায়নী। যেমন জাঁহাবাজ তেমনি স্বার্থপর। জিভের ধার অসাধারণ। আত্মীয়স্বজনেরা সহসা ঘাঁটায় না এই মহিলাকে। সবিতার বাবার মামাতো বোন কাত্যায়নীর বয়স সবিতার মা নিভাননীর মত হলেও চেহারায় ও স্বভাবে এই দুই ননদ ও ভ্রাতৃবধূ প্রায় দুই মেরুর বাসিন্দা। ছিপছিপে চেহারার নিভাননী যেখানে শান্ত, ধৈর্যশীলা এবং সংসারের প্রতি প্রায় বিমুখ, সেখানে ভয়ংকর মোটা কাত্যায়নীর স্বভাব এই বয়সেও উগ্র। নিঃসন্তান হয়েও কাত্যায়নী ঘোর সংসারী। দোর্দণ্ড প্রতাপে দেওরের সংসারে তিনি রাজত্ব করেন। দেওরপো মন্টা এই বিধবা মহিলার চোখের মণি। কাত্যায়নীর মতে মন্টার মত একটি ছেলে নাকি একান্তই বিরল। মন্টাকে নিয়ে

তিনি আকাশ-কুসুম রচনা করেন এবং তারই অঙ্গ হিসেবে মন্টার সঙ্গে সবিতার বিয়ে দেবার জন্যে ভয়ানক উদগ্রীব।

সবিতার বাবা তাঁর এই একমাত্র মামাতো বোনটিকে খুবই ভালোবাসতেন। সেই সূত্রে ভাইয়ের সংসারে খুবই যাতায়াত ছিল তাঁর। নিভাননী প্রচণ্ড ভয় করতেন এই ননদটিকে। এককালে ভায়ের সংসারে যথেষ্টই প্রতিপত্তি ছিল কাত্যায়নীর। কিন্তু পবিত্রর বিয়ের পরে এই সংসারে বাসন্তীর আগমনের পর থেকে ক্যাত্যায়নীর প্রতিপত্তি যেন একটু একটু করে খর্ব হতে শুরু করে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে কাত্যায়নী কখনও খুশি ছিলেন না বাসন্তীর ওপর। আড়ালে আবডালে স্কুলের মাস্টারনী বাসন্তীর নিন্দা করতেও ছাড়তেন না তিনি। কিন্তু সামনাসামনি এই শিক্ষিতা গম্ভীর প্রকৃতির বধূটির ওপর কোনো ব্যাপারে তেমন জোর খাটাতে ভরসা পেতেন না। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে বাসন্তীর সঙ্গে নিভাননীর অনেক তফাৎ। ইদানীং তিনি এ বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন তার বেশিরভাগ সময়টাই কাটান নিভাননীর ঘরে। বাসন্তীর ব্যক্তিত্বকে তিনি সমীহ করেন বলেই যতটা সম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলেন। আবার, এই সমীহ করাটাকেও তিনি খুশিমনে গ্রহণ করতে পারেন না। একটা পরাজয়ের গ্লানি যেন সর্বদাই তাঁর মনটাকে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে তোলে। ক্ষুব্ধ হন কাত্যায়নী, আর সেই ক্ষোভ বক্র বাক্যবাণের আকারে প্রায়ই বিদ্ধ করে নিভাননীকে। কাত্যায়নী গায়ের জ্বালা মেটান তাঁর ওপর। নিঃশব্দে সবকিছু সহ্য করেন নিভাননী।

কাত্যায়নীর অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল নিজের দেওরপো মন্টার সঙ্গে বিয়ে দেন সবিতার। এ বাড়িতে এলেই তিনি একান্তে নিভাননীকে বোঝাতেন, বুঝলে বৌঠাকুরণ, তোমার সবুকে কিন্তু আমার মন্টার সঙ্গে দারুণ মানাবে। ঠিক যেন হর-গৌরী। নিভাননী জবাব না দিয়ে চুপ্ করে থাকতেন। কাত্যায়নী আবার বলতেন, অবশ্যি বলতে পারো ছেলেটা লেখাপড়া তেমন শেখেনি। তা' বাপু, ছেলেদের লেখাপড়া তো কেবল রোজগারের জন্যে। আমার মন্টা যা রোজগার করে তা' অনেক বি-এ, এম-এ'ও পারে না। বললে বিশ্বাস করবে না বৌঠাকুরণ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। অনেকদিন ধরেই তো একটা মোটর গাড়ি কিনবে কিনবে করছিল। তা বাপু, আমিই কিনতে দিইনি। কি দরকার এত খরচপত্র করে? কিন্তু ছেলেটাও ছাড়বে না। শেষে বললাম, সবুকে ঘরে আনার পরেই না হয় কিনিস। বিয়ের পরে দুটিতে মিলে দিব্বি হাওয়া খেয়ে বেড়াবি। জানো বৌঠাকুরণ, ছেলেটা সেই থেকে বসে বসে দিন গুণছে। আর বলতে কি, সবুকে ওর মনেও ধরেছে। কথাটা শেষ করে কাত্যায়নী এমনভাবে চোখ মটকে একটু হাসতেন যে ননদের চোখ-মুখের ভাব দেখে নিভাননী নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়তেন।

কাত্যায়নী থামতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন নিভাননী, তোমার দেওরপো সবুকে দেখলো কোথায় ঠাকুঝি ?

জবাব দিয়েছিলেন কাত্যায়নী, বারে, সেই সেবার আদিত্যর ছোট মেয়ের বিয়েতে তো সবু গিয়েছিল সেখানে। মণ্টা তো সেখানেই দেখেছে তাকে।

—ও, তাই বুঝি। নিভাননী আর কোন কথা বললেন না। মন্টাকে জামাই করার কথা যদিও তিনি কখনও কল্পনায় আনেননি, কিন্তু ননদের কথায় অসম্মতি প্রকাশ করতেও তিনি সাহস পেতেন না পাছে মুখরা কাত্যায়নী কোনরকম কড়া কথা বলে ফেলেন। কাত্যায়নীর পীড়াপীড়িতে মাঝে মধ্যে কেবল বলতেন, সবু তো এই সবে চাকরিতে ঢুকেছে। এর মধ্যেই কি ও বিয়ে করতে রাজি হবে ?

—বেশ তো, যাক্ না কয়েকটা মাস, কাত্যায়নী বলতেন, চাকরি করার যখন শখ হয়েছে তখন মিটিয়ে নিক না সেই সখ। বিয়ের পরে তো আর চাকরির দরকার হবে না।

বলেছিলেন নিভাননী, কেন ? এ বাজারে একটা ভালো চাকরি কি ছেড়ে দেয়া উচিত ? বিয়ের পরে কত মেয়েই তো চাকরি করছে।

—তা করুক। তবে মন্টার বউর ওসব দরকার হবে না। মন্টা নিজে যা রোজগার করে তা-ই তো ওর বউ খরচ করে উঠতে পারবে না।

—না ঠাকুরঝি, নিভাননী বলতেন, সবু কি দরকারের জন্য চাকরি করে ? ওর দাদা তো যথেষ্টই রোজগার করে। আসলে ঘরের মধ্যে আট্‌কে থাকতে ওর ভালো লাগে না।

—যাই বলো বৌঠাকুরণ, এসব অভ্যেস কিন্তু মোটেই ভালো নয়। বাইরের দিকে মেয়েদের এত টান থাকবে কেন ?

নিভাননী আর কোন জবাব দিতেন না।

মন্টার হাতে সবিতাকে তুলে দেবার ব্যাপারে নিভাননী যেমন কাত্যায়নীকে কখনও কথা দেন নি, তেমনি আবার সরাসরি নাকচও করেন নি। ভয়েই করেন নি হয়তো। কিন্তু কাত্যায়নী এটাকেই তাঁর বৌঠাকুরণের সম্মতি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

কথায় কথায় নিভাননী একদিন বলেছিলেন কাত্যায়নীকে, বুঝলে ঠাকুরঝি, ওরা সব একালের মেয়ে। ওদের নিজেদেরও তো একটা মতামত আছে। তা' ছাড়া বৌমা রয়েছে। বলতে গেলে সে-ই তো ওর মা। আমি তো কেবল পেটে ধরেছিলাম সবুকে। বুকে করে মানুষ করেছে তো বৌমা।

বাসন্তীর প্রসঙ্গে মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল কাত্যায়নীর। তিনি

জানতেন, বাসন্তী বাস্তবিকই শক্ত ঠাঁই। তাই তিনি নিভাননীকে বলেছিলেন, বাপ যখন নেই তখন তুমি ও পবিত্রই তো ওর গার্জেন। এর মধ্যে আবার বৌমাকে টানছো কেন? তোমরা, বিশেষ করে তুমি বেঁচে থাকতে সে কে? তার পছন্দ মতই কি সবুর বিয়ে হবে? তাছাড়া আমার মন্টা কোন্ বিষয়েই বা খাটো?

মিথ্যে বলেন নি কাত্যায়নী। মন্টার বিদ্যে-বুদ্ধি যা-ই থাকুক না কেন, ব্যবসার নামে নানা ফন্দি-ফিকির করে বেশ দু'পয়সা ঘরে আনছে সে। আর, বাঁকা পথে রোজগার হলে সেই বাঁকা পথ ধরে আরও কিছু আনুসঙ্গিক যে চরিত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাও ঘটেছিল মন্টার চরিত্রে।

কাত্যায়নীর পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে নিভাননী একদিন বাসন্তীকে বলেই ফেলেছিলেন কথাটা। বলেছিলেন, সবুর বিয়ের জন্যে তো তোমরা উঠেপড়ে লেগেছ, বৌমা। তোমাদের কাতুপিসি সেদিন তার দেওরপো'র কথা বলেছিল। ছেলেটি নাকি ভালো, পয়সা কড়ি নাকি ভালই রোজগার করে।

জবাবে সেদিন বাসন্তী গম্ভীর কন্ঠে বলেছিলেন, সবুর বিয়ে দেব একটি ভালো পাত্রের সঙ্গে, পয়সার সঙ্গে তো নয়।

নিভাননী একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন, যদি সবুর নিজের তেমন কোন ইচ্ছে থাকে। তুমি বরং তাকে একবার জিজ্ঞেস করেই দেখো, বৌমা।

—না, তাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। সবুর মন আমি জানি। পয়সা রোজগার করছে বলে সে একটা মূর্খ চরিত্রহীন ছেলেকে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইবে না।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন নিভাননী, তুমি এত কথা জানলে কি করে, বৌমা। ঠাকুরঝি তো কোনদিন আমাকে এ সব কথা বলে নি।

—দেওরপো'র কীর্ত্তির কথা তিনি নিজে আপনাকে বলতে যাবেন কেন? কাতুপিসি আমাকে সোজাসুজি কিছু না বললেও তাঁর মনের কথা আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছি। তাই সেই ছেলেটা সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম।

—সত্যি, আশ্চর্য! ঠাকুরঝি এই কথাটা আমার কাছে এতদিন চেপে রেখেছিল! আমি আগে জানলে তো কথাটা একবার তাকে জিজ্ঞেস করতাম।

—সর্বনাশ, এসব কথা আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাবেন না, মা। লংকাকাণ্ড বাধিয়ে তুলবেন তিনি। তবে পাত্র যা-ই হোক না কেন, পাত্রীর অভাব এদেশে কোনকালেই নেই। ঐ গুণধরের জন্যেও হয়তো পাত্রীর অভাব হবে না। তবে, কেন যে কাতুপিসির সবুর ওপর নজর পড়লো তা-ই ভেবে পাচ্ছি না।

—কি জানি মা, এখানে এলেই তো ঠাকুরঝি কেবল ঐ কথা বলে।

—বলে তো বলুক। আপনি যেন আবার তাঁকে কথা দিয়ে বসবেন না।

—না মা, তোমাদের জিজ্ঞেস না করে আমি কথা দিতে যাবো কেন?

বলেছিলেন বাসন্তী, আপনি তাকে স্পষ্ট বলে দেবেন যে তাঁর দেওরপো'র সঙ্গে সবুর বিয়ে দিতে আমাদের মোটেই ইচ্ছে নেই।

বাসন্তীর কথায় নিভাননী সেই মুহূর্তে একটু বিব্রত বোধ না করে পারেন নি। একথা সোজাসুজি কাত্যায়নীর মুখের ওপর বলার মত সাহস তাঁর ছিল না। তিনি বিষয়টি বাসন্তীর ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে বলেছিলেন, দেখ বৌমা, আমি যখন সত্যি সত্যি কোন কিছুর মধ্যে থাকি না, তখন সবুর বিয়ের ব্যাপারেও আমাকে তার মধ্যে টেনো না। তোমরা যা ভালো বোঝ তা-ই করো। তুমিই বরঞ্চ ঠাকুরঝিকে কথাটা বলে দিও। আমি কিছু বলতে গেলে হয়তো দু'কথা শুনিয়ে দেবে।

জবাবে বলেছিলেন বাসন্তী, আমি এসব কথা তাঁকে বলতে যাবো কেন, মা? তিনি তো বিয়ের ব্যাপারে আমাকে কখনও কিছু বলেন নি। বলেছেন আপনাকে। জবাবও আপনাকেই দিতে হবে।

কাত্যায়নীকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারেন নি নিভাননী। এমনকি আকার ইঙ্গিতেও তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হন নি তিনি। কাত্যায়নী কিন্তু ধরেই নিয়েছিলেন যে এই বিয়েতে নিভাননীর মত আছে। সেই আশায় আশান্বিত হয়েই তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

অবশেষে একদিন একটা উড়ো খবর পেয়ে কাত্যায়নী একেবারে জ্বলে উঠলেন। সবুর বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র নাকি কলকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তারের একমাত্র ছেলে—বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার।

আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না কাত্যায়নী। মেয়েটাকে বড়ই পছন্দ হয়েছিল তাঁর। নিজের ভাইঝি। ছেলেবেলা থেকে তাকে দেখেছেন। তার ওপর মেয়েটাকে মন্টারও চোখে ধরেছে। কাজেই এমন মেয়েটা হাতছাড়া হলে শেষে ঐ দেওরপোর কাছেই হয়তো তাকে কথা শুনতে হবে।

মন্টার স্বভাব চরিত্রের সব খবরই কাত্যায়নী রাখতেন। কিন্তু তা' নিয়ে কখনও কিছু বলতেন না তাকে। মন্টার মা-বাবা কিছু বললে উল্টে তাদের ধমকে উঠতেন তিনি। ব্যাটাছেলেদের এসব দোষত্রুটি একটু আধটু থাকেই। তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। কিন্তু সেদিন একটু বেশি রাতে বেসামাল অবস্থায় মন্টাকে বাড়ি ফিরতে দেখে কেন যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কাত্যায়নী। চিৎকার করে বলে ওঠেন, ওরে ও হতভাগা, বেশ তো

নেশা-ভাঙ্ করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস। ওদিকে সেই মেয়েটা যে হাতছাড়া হয়ে যায়।

জড়িত কন্ঠে মন্টা বললে, কার কথা বলছো, বড়মা ?

—বলছি আমার অদৃষ্টের কথা! কপাল চাপড়ে বলেছিলেন কাত্যায়নী, এমন ভালো মেয়ে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। সেই মেয়েটাই যে এবার হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে।

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে মন্টা। একটু সময় স্থির হয়ে থাকে সে। তারপর অকস্মাৎ উঠে এসে কাত্যায়নীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে নেশার ঘোরে কাঁদতে কাদতে বললে, একি বলছো, বড়মা ? সবিতা আমার হবে না ? তুমি—একটু চেষ্টা করলেই হবে। আমি—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বড়মা, বিয়ের পরে এসব ছাই-পাশ আমি আর একেবারেই ছোঁব না।

—এরকম প্রতিজ্ঞা তো এর আগেও অনেকবার করেছিস তুই। তিক্ত কণ্ঠে বললেন কাত্যায়নী।

—না বড়মা, এবার আর ভুল হবে না। তুমি এই পাত্রীকে হাতছাড়া করো না। আমি কথা দিচ্ছি—। বলতে বলতে কাত্যায়নীর পায়ের ওপর মুখ ঘসতে থাকে মন্টা।

মুহূর্তে মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে কাত্যায়নীর। মন্টাকে তার খাটে শুইয়ে দিয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকেন তিনি, এমন একটা ভালো মেয়েকে হাতছাড়া করতে আমারও কি ইচ্ছে হয়, বাবা! কিন্তু যা সব শুনছি তাতে তো আর ভরসা রাখতে পারছি না। কাল একবার ওখানে গিয়ে দেখি। একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে। কথা দিয়ে কথার খেলাপ!

পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে মন্টা, হ্যাঁ বড়মা, তাই করো। ওকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়েই করবো না—এই তোমাকে বলে রাখছি। ওকে না পেলে আমি সন্ন্যেসী হয়ে হিমালয় চলে যাবো

—একি অলক্ষুণে কথা বলছিস, বাবা! ত্রস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন কাত্যায়নী, শেষে কিনা একটা মেয়ের জন্যে বিবাগী হয়ে যাবি ?

মন্টা আর কোন কথা বলে না। সেই মুহূর্তে বোধহয় নেশার ঘোরে সে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় চলে যাবার পরিকল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কাত্যায়নী আপন মনেই গজ গজ করতে থাকেন, হুঃ, ইঞ্জিনীয়ার—বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার! যত নষ্টের গোড়া ঐ মাস্টারনী বৌটা। একেবারে বিদ্যেধরী! আমার নামও কাত্যায়নী। আমিও দেখে নেব কত ধানে কত চাল। এতদিন আশায় রেখে এখন কিনা বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার!

পরের দিন বিকেলে কাত্যায়নী সবিতাদের বাড়িতে এসে যখন হাজির হলো তখন একা নিভাননী ছাড়া আর কেউ বাড়ি ছিল না। সবিতা অফিসে, আর পবিত্র আদালতে। বাসন্তী যদিও এইসময় স্কুল থেকে ফিরে আসেন কিন্তু সেদিন কেন যেন দেরী হচ্ছিল তাঁর।

কাত্যায়নী সোজা এসে ঢুকলেন নিভাননীর ঘরে। রণরঙ্গিনী মূর্তি তাঁর। নিভাননী তখন চোখে চশমা এঁটে ভাগবত পড়ছিলেন। ননদের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে বুকটা তাঁর কেঁপে উঠ্‌লো। বই বন্ধ করে চশমা খুলে রেখে ননদের দিকে তাকাতেই কাত্যায়নী নিভাননীর পাশে মাদুরের ওপর সশব্দে বসে পড়ে বলে ওঠেন, এ তোমাদের কেমন ব্যবহার, বৌঠাকুরণ? কথা দিয়ে কথা রাখতে পারো না!

ননদের কথার জবাবে নিভাননীর বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি আবার তোমাকে কবে কথা দিলাম, ঠাকুরঝি? কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করে কিছু না বলে চুপ্‌ করে রইলেন। এই ননদটিকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। কথায় কেবল কথাই বাড়বে, আর তার পরিণতি হয়তো ঘটবে একটা বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

নিভাননীকে চুপ করে থাকতে দেখে কাত্যায়নী আবার চোখ ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, কি বৌঠাকুরণ, চুপ্‌ করে রইলে কেন? বুঝতে পারছো না কিসের কথা বলছি? আমাকে কথা দিয়ে শেষে তোমরা নাকি কোথাকার একটা ইঞ্জিনীয়ার পাত্রর সঙ্গে সবুর বিয়ে ঠিক্‌ করেছ?

এতক্ষণে কথা বলেন নিভাননী। মৃদু কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, তাই তো শুনছি।

—শুনছি মানে? জ্বলে ওঠেন কাত্যায়নী, তোমার মেয়ে, আর তুমি জানো না কার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক্‌ হলো? আমাকে কি কচি খুকি পেয়েছ যে একথা বিশ্বাস করতে হবে?

ভীত কণ্ঠে জবাব দেন নিভাননী, সত্যি, বিশ্বাস করো ঠাকুরঝি, আমি এসবের মধ্যে থাকি না। ওরাই সব ঠিক্‌ করেছে।

—তা'হলে তুমি বলতে চাইছো তুমি এসবের কিছুই জানো না?

একটা ঢোক গিলে নিভাননী বললেন, জানবো না কেন। ওদের মুখেই শুনেছি।

—পাত্র দেখতে কেমন?

—আমি দেখিনি। তবে শুনেছি দেখতে নাকি খুব ভালো।

—বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার?

—হ্যাঁ, কোন্‌ এক ডাক্তারের নাকি একমাত্র ছেলে।

—যোগাযোগ ঘটলো কেমন করে? জেরা করার মত একটির পর একটি প্রশ্ন করে চলেন কাত্যায়নী।

—আমি ঠিক জানি না। সবকিছুই করেছে পবিত্র আর বৌমা। জবাব দেন নিভাননী।

—পবিত্র না-হাতি! গর্জে ওঠেন কাত্যায়নী, পবিত্র তো তার কোর্ট-কাছারী নিয়েই ব্যস্ত। আমি বুঝতে পারছি এসব তোমার ঐ বৌমার একার ই কাণ্ড!

নিভাননী চুপ করে থাকেন। কাত্যায়নী চোখ-মুখ ঘুরিয়ে, হাত নেড়ে এবং পরনের অর্গেণ্ডির থান কাপড়ের আঁচলে খস খস শব্দ তুলে বলতে থাকেন, আমার মন্টা না হয় বিলেতেই যায় নি, কিন্তু তাই বলে পাত্র হিসেবে তাকে ফেলনা বলে মোটেই মনে করো না, বৌঠাকুরণ। জানো, আমার সংসারে মেয়ে দেবার জন্যে কলকাতার তাবড় তাবড় লোক হন্যে হয়ে দু'বেলা যাতায়াত করছে। নেহাত সবুকে ওর চোখে লেগেছিল বলেই না তাদের সবাইকে নাকচ করে দিয়েছি। তা বাপু, সাধা লক্ষ্মী যখন এমনিভাবে পায়ে ঠেললে তখন আমিও এই বলে রাখছি—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না কাত্যায়নী। তার আগেই নিভাননী তাঁর একটা হাত চেপে ধরে তাকে বাধা দিয়ে ত্রস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, না—না ঠাকুরঝি, আমার সবুকে শাপমান্যি করো না তুমি। ওর কোন দোষ নেই। ঠিকই বলেছ তুমি। সব কিছুই করেছে বৌমা।

হঠাৎ দরজার কাছে বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে দু'জন মহিলাই চমকে ওঠেন। স্কুল থেকে ফিরে এসে শাশুড়ির ঘরে কাত্যায়নীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে বাসন্তী কখন যে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তা দুজনের একজনও টের পান নি।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কাত্যায়নীর উদ্দেশে বাসন্তী বললেন, হ্যাঁ কাতুপিসি, মা ঠিকই বলেছেন। সবুর বিয়ের ব্যাপারে উনি বাস্তবিকই তেমন কিছু জানেন না। যা করার আমিই করেছি। যদি কিছু বলতে হয তো আমাকেই বলুন।

বাসন্তীর কথায় কাত্যায়নী সহসা কোন জবাব দিতে পারেন না। বোধহয় বাসন্তীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি জয়ী হতে পারবেন কিনা তাই ভাবতে থাকেন মনে মনে। আর, তেমন একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষের আশংকায় মনে মনে শিউরে উঠে অপেক্ষা করতে থাকেন নিভাননী।

হঠাৎ পট পরিবর্তন। নিভাননীর আশংকা দূর করে এবং বাসন্তীকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পশ্চাদপসরণ করেন কাত্যায়নী। কণ্ঠস্বরের চড়া পর্দা খানিকটা খাদে নামিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো বাসন্তীর

দিকে একপলক তাকিয়ে নিভাননীকে বললেন, না—না বৌঠাকুরণ, এতে আর বলাবলির কি আছে? তোমাদের মেয়ে, তোমরা যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে দেবে। তাতে আমাদের কি বলার থাকতে পারে? আমি কেবল সবুর কথা চিন্তা করেই আমার দেওরপো'র কথা বলছিলাম। কোথায় কোন অপরিচিতের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তার চাইতে জানাশোনা ঘর, আমি নিজে রয়েছি—

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে কাত্যায়নী গা-ঝাড়া দেবার মত ভঙ্গি করে আবার বলে ওঠেন, যাক্‌গে ওসব কথা। এ নিয়ে আলোচনা করে আর কি হবে? যার যেখানে ভবিতব্য সেখানে তো হবেই।

কাত্যায়নীর রকম-সকম এবং তার দার্শনিকসুলভ কথাবার্তায় বাসন্তী ততক্ষণে ধরে ফেলেছিলেন যে কাত্যায়নীর মত মহিলার এ জাতীয় পশ্চাদপসরণ একান্তই সাময়িক। তবে ভরসার মধ্যে এই যে আপাততঃ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা অনেকটাই কমেছে। তাই তিনি সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

বাসন্তী সরে যেতেই নিভাননী বোধহয় ননদকে কিছু সান্ত্বনা বাক্য বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর পেলেন না তিনি। তার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে কাত্যায়নী বললেন, আমি তা'হলে এবার চলি, বৌঠাকুরণ।

—সেকি ঠাকুরঝি, এর মধ্যেই যাবে? কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বলে ওঠেন নিভাননী। সেই মুহূর্তে এই মুখরা ননদটির জন্যে কেমন যেন একটু দুঃখ হচ্ছিল তাঁর। মহা বলশালীকে বলহীনের মত আচরণ করতে দেখলে মানুষ যেমন তার প্রতি অনুকম্পা বোধ করে, এ যেন অনেকটা তাই।

কাত্যায়নী কিন্তু কোন জবাব দেন না। নিজের গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নিলেন, একটু টেনে দিলেন মাথার ঘোমটা, তারপর গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। বৌঠাকুরণের কথার কোন জবাবই দিলেন না।

কাত্যায়নী চলে যেতেই শাশুড়ির ঘরে এসে দাঁড়ান বাসন্তী। তারপর নিভাননীর উদ্দেশে বললেন, এ একরকম ভালই হলো, মা। উনি নিজে এসে সবকিছু জেনে গেলেন। এবার নিশ্চিন্ত মনে অন্য কোথাও গিয়ে নিজের দেওর-পো'র জন্যে পাত্রী খুঁজে বেড়ান।

বাসন্তী সহজভাবে কথাটা বললেও নিভাননীর পক্ষে অত সহজে তাঁকে সমর্থন করা সহজ ছিল না। তিনি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর এই ননদটিকে জানেন। একবার ক্ষেপে গেলে এঁর অসাধ্য কিছু নেই। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে হয়তো। তাই তিনি জবাবে চিন্তিত সুরে কেবল বললেন, ভালো তো বলছো, মা। এবার ভাংচি না দিলেই বাঁচি।

(ছয়)

সব্যসাচী বরাবর বলে এসেছিল যে সে নিজে কখনও পাত্রী দেখবে না ; তার পরিবারের লোকেরা যাকে দেখে পছন্দ করবে তাকে বিয়ে করতেই সে রাজি। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে সে একথা ঘোষণা করেছিল তা' নয়। তার বরাবরই বিশ্বাস ছিল তার পরিবারের লোকেরা একটি ভালো মেয়েকেই পাত্রী হিসেবে পছন্দ করবে। অবশ্য সব্যসাচীর এই মনোভাবের পেছনে একটা বিশেষ কিছু করার মত ইচ্ছে যে একেবারেই কাজ করেনি তা' নয়। একালে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাত্র নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করে। এযুগের রেওয়াজ এটাই। সে যুগে অবশ্য এ সব ছিল না। পাত্রর সঙ্গে পাত্রীর সর্বপ্রথম দেখা হতো ছাঁদনাতলায়। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার হয়েও সব্যসাচী কিন্তু সেই পুরানো প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইলে।

মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে কিন্তু সব্যসাচী একটা প্রচণ্ড কৌতূহল অনুভব করে সবিতা সম্পর্কে—কে সেই মেয়েটি ? কেমন দেখতে ? চাল-চলন কথাবার্তা তার কেমন ?

এতদিন পাত্রী না-দেখার ঘোষণা দাবিয়ে রেখেছিল তার সেই কৌতূহলকে। মনে মনে সে বলতো, এত অস্থির হবার কি আছে ? কৌতূহলের অবসান ঘটলেই তো সব শেষ। তার চাইতে কৌতূহল জীইয়ে রেখে তারিয়ে তারিয়ে তা' উপভোগ করার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ। পাত্রীকে যারাই দেখেছে তারাই একবাক্যে বলেছে যে পাত্রী নাকি অপূর্ব সুন্দরী। সব্যসাচীর ছোট জামাইবাবু প্রথমবার দেখে এসে মন্তব্য করেছিলেন—প্যারাগন অব বিউটি। এমন পাত্রী লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। ঠাট্টা করে তিনি বলেছিলেন, জানো অসভ্য, শুভদৃষ্টির সময় চোখে একটা গগল্‌স পরে নিও, নইলে রূপের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। সেদিন অকস্মাৎ ছোট জামাইবাবুর কথায় সব্যসাচীর মনে হল সবিতাকে দেখার জন্যে না হোক, একবার সজলদার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত। এককালে ঐ সজলদার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্টতাই ছিল তার।

সব্যসাচী যতই ভাবে ততই যেন সজলদার প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সত্যি সত্যি সজল মিত্র কিনা তা' নিয়ে বিবেচনা করতে বসলেই নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে ওঠে। নিজেকেই

নিজে প্রশ্ন করে, কিহে জিতেন্দ্রিয় যুবক, হঠাৎ সজলদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মনটা এমন আনচান করে উঠলো কেন? আসল উদ্দেশ্যটি বলেই ফেল না, বাপু।

না, বেশিদিন শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকে রাখা চলে না। অবশেষে একদিন সব্যসাচী নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তার এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সবিতা। সজলদা কেবল উপলক্ষ। এই উপলক্ষের খবর যতদিন তার অজ্ঞাত ছিল ততদিন নিজের কৌতূহলকে দমন করে রাখতে তেমন একটা অসুবিধে হয় নি। কিন্তু যেইমাত্র উপলক্ষ এসে হাজির হলো সঙ্গে সঙ্গে সেই কৌতূহল লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মত উদ্দাম হয়ে উঠলো।

বিয়ের মাত্র দিন পনেরো বাকি। হঠাৎ একদিন সবিতাদের অফিসের রিসেপশনে আবির্ভাব ঘটলো সব্যসাচীর। ছোট জামাইবাবুর কথা শিরোধার্য করেই সে দেখা করতে এসেছে তার সজলদার সঙ্গে। তবে, রথ দেখার চাইতে কলা বেচার দিকেই যে তার প্রধান নজর এটা তখন তার নিজের কাছেও স্পষ্ট। প্রথমটায় অবশ্যি একটু লজ্জা করছিল তার। বাড়ির কেউ টের পেলে প্রেস্টিজ পাংচার। তবে ভরসার মধ্যে এই যে বাড়ির কেউ তো আর জানতে আসছে না যে মুখে বড়াই করেও শেষ পর্যন্ত সে চুপি চুপি পাত্রী দেখে এসেছে। আর যদি কেউ কোনরকমে জানতেই পারে তা'হলে উপলক্ষ সেই সজলদা তো আছেই।

তবে, সমস্যা খোদ সবিতাকে নিয়ে। সে যদি চিনে ফেলে তাকে? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো তা' তো সম্ভব নয়। সবিতা তাকে কখনও দেখে নি। তার যতদূর জানা আছে পাত্রীর বাড়িতে তার কোন ছবি পাঠানো হয় নি। সবিতার দাদা-বৌদি কয়েকবারই এসেছিলেন তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে। একবার তাদের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল সব্যসাচীর। সামান্য কথাবার্তা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। কাজেই সবিতার পক্ষে তাকে চিনতে পারা সম্ভব নয়।

সব্যসাচী ঘরে ঢুকে সবিতাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যায়। পাত্রী সুন্দরী—প্যারাগন অব বিউটি—লাখে একটি মেলে প্রভৃতি বাক্যগুলি দিয়ে পাত্রীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা হলেও সৌন্দর্যের সঠিক মাপকাঠির অভাবে পাত্রীর যে ছবিটি সব্যসাচীর মনে আবছাভাবে গড়ে উঠেছিল, তাকে হঠাৎ কোন নিপুণ শিল্পী যেন তুলির টানে আরও সুষমামণ্ডিত করে তুললে। কল্পনা হেরে গেল বাস্তবের কাছে, যদিও এর উল্টোটাই সচরাচর ঘটে থাকে সংসারে। মনে মনে সে বললে, এ যে দেখছি ইয়ারো আন্-ভিজিটেডের চাইতে ইয়ারো ভিজিটেড্ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সেই মুহূর্তে সবিতার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তার মনে হলো, রূপ ও শ্রী একত্রে মিশে একটি নারীকে যে কতটা লাবণ্যময়ী করে তুলতে পারে তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যেন এই মেয়েটি। আর পনেরোটা দিন পরে এই মেয়েটিই যে তার জীবন

সঙ্গিনী হতে চলেছে এমন একটা কল্পনা সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর দেহ-মনে জাগিয়ে তোলে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ।

ছোট্ট ছিমছাম রিসেপশন রুমে টেবিলের ওপর একখানি পেলব হাত প্রসারিত করে দিয়ে অন্য হাতে কি যেন লিখছিল সবিতা। প্রসারিত বাঁ হাতে কুচকুচে কালো ব্যাণ্ড সমেত ছোট একটি হাতঘড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। ডান হাতে কেবল একটি বালা। গলায় একগাছা সরু চেন, কানের সঙ্গে লেপ্টে ছিল দু'টো লাল পাথর লাগানো টব্। মাথার খোঁপাটা শিথিল ভঙ্গিতে নেমে এসেছিল ঘাড়ের ওপর। হাল্কা কমলা রংয়ের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ্ করা গায়ের ব্লাউজ। সেই পরিবেশে সবিতার দেহ ভঙ্গিমা ও রূপ একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছিল সব্যসাচীর চোখে।

প্রথমটায় সব্যসাচীকে লক্ষ্য করে নি সবিতা। সব্যসাচীও স্থান কাল পাত্র ভুলে একদৃষ্টে কেবল তাকিয়েছিল নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গিনীর দিকে। সেই অবস্থায় একটা বিলিতি অফিসের রিসেপ্শনিস্টের দিকে এমনভাবে তাকানো যে একান্ত দৃষ্টিকটু সেদিকেও লক্ষ্য ছিল না তার।

হঠাৎ সব্যসাচীর দিকে নজর পড়তেই সবিতার সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। লোকটা অমনভাবে নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? দারুণ অসভ্য তো! কিন্তু সব্যসাচীর ধবধবে গায়ের রঙ ও নিখুঁত সাহেবী পোশাকের দিকে তাকিয়ে তাকে একজন দামী কাস্টমার মনে করে নিজের বিরক্তিটুকু চেপে গিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে সবিতা তাকায় তার দিকে। তারপর বিলিতি ভঙ্গি ও স্পষ্ট উচ্চারণে আহ্বান জানায় তাকে, ইয়েস্, কাম ইন্।

সব্যসাচী ভেতরে প্রবেশ করে। সবিতা একটা গদি আঁটা চেয়ারে তাকে বসতে অনুরোধ করে তেমনি বিলিতি ভঙ্গিতেই ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে, আপনার কোন উপকারে আসতে পারি কি?

সবিতার নিখুঁত আদব-কায়দায় মনে মনে একটু হাসে সব্যসাচী। তারপর স্পষ্ট বাংলায় জবাব দেয়, আমি আপনাদের ছোট সাহেব মিস্টার মিত্রের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

সব্যসাচীর বাংলা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সবিতার বলার ভঙ্গিতে দেখা দেয় একটা পরিবর্তন। একটু সলজ্জ হেসে সে বললে, মাপ করবেন। আপনাকে অবাঙ্গালী ভেবেছিলাম। তা, মিত্তির সাহেবের সঙ্গে কি আপনার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে?

—না—না, বলে ওঠে সব্যসাচী, আগে থেকে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই আমার। উনি আমার বিশেষ পরিচিত, তাই একবার দেখা করতে এসেছি।

—তাই তো—একটু দ্বিধা করে সবিতা।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া উনি দেখা করেন না নাকি? সবিতার সুন্দর মুখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

—না, ঠিক্ তা' নয়। একটু সময় চিন্তা করে সবিতা। একমাত্র কাস্টমার ছাড়া ছোট সাহেব যে যখন-তখন বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না, এই সত্য কথাটা বলে দিয়ে এই ভদ্রলোককে নিরাশ করতে কেন যেন মন চাইছিল না তার। তাই সে তাড়াতাড়ি বললে, দু'মিনিট বসুন। ব্যবস্থা করছি আমি।

সবিতা একখানা ভিজিটিং স্লিপ নিজের কাছে টেনে নিয়ে খস্ খস্ করে কি যেন লেখে। তারপর সব্যসাচীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি নাম লিখব আপনার?

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে সব্যসাচী নিজের পুরো নাম না বলে কেবল বললে, লিখুন এস. বাসু।

—অফ্ ক্যালকাটা?

এস. বাসু অফ্ ক্যালকাটা বললে সজল মিত্র হয়তো তাকে নাও চিনতে পারে। তাই সে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, না—না, অফ্ লন্ডন।

—লন্ডন? ভুরুযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সবিতার।

সর্বনাশ, সবিতা তাকে চিনতে পারলে নাকি? তা'হলেই হয়েছে। লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কেবল মাথা নাড়ে সব্যসাচী।

চোরের মন পুঁটলির দিকে। সবিতা কিন্তু কিছুই সন্দেহ করেনি। সন্দেহ করার মত কিছু ছিলও না। তার ভবিষ্যৎ বর সব্যসাচী বোস ও এই এস. বাসু যে অভিন্ন লোক হতে পারে এমন একটা চিন্তা তার মাথায়ও আসে নি। লন্ডনের পরিচয় সূত্রে এই ভদ্রলোক তাদের ছোটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আগে থেকে কোনরকম খবর না দিয়ে, এটা একটু অস্বাভাবিক লাগছিল বলেই তখন সে 'লন্ডন' শব্দটা শুনে সামান্য চমকে উঠেছিল।

বেয়ারা স্লিপ নিয়ে চলে যায় ছোট সাহেবের ঘরের দিকে। সবিতা মন দেয় নিজের কাজে। আর সব্যসাচী সামনের টেবিলের ওপর থেকে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা উল্টে যেতে থাকলেও চোখ দুটো তার মাঝে মাঝেই এসে পড়তে থাকে কর্মব্যস্ত সবিতার ওপর। বাস্তবিকই সুন্দর। ছোটজামাইবাবু মিথ্যে বলেন নি। প্যারাগন অফ্ বিউটিই বটে।

কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করাটাই একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। তা' সে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই হোক্ কিম্বা পরীক্ষার ফল বের হবার জন্যেই

হোক্। বিশেষ করে, সেই অপেক্ষা করার সময়টুকু যদি অনির্দিষ্ট হয় তা'হলে সেই বিরক্তির মাত্রা বেড়েই ওঠে। কিন্তু অপেক্ষা করাটা যে এত মধুর তা' এর আগে সব্যসাচীর কখনও মনে হয় নি। সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, সজল মিত্র যদি তাকে কয়েক ঘন্টা এখানে এমনিভাবে অপেক্ষা করিয়ে রাখে তা'হলে সে দু'হাত তুলে তার জয়গান গাইতে রাজি।

সচ্যসাচীর কপাল খারাপ। কয়েট ঘন্টা তো দূরের কথা, কয়েক মিনিট সব্যসাচীকে অপেক্ষা করাতেও ছোট সাহেব রাজি ছিলেন না। বেয়ারা স্লিপ দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক আসে তার। সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর মনে হয়েছিল, 'অফ্ লন্ডন' লেখার জন্যেই বোধহয় তার এত তাড়াতাড়ি ডাক এলো। সজলদা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন তাকে। ঐ শব্দ দু'টো না লিখলে সম্ভবতঃ এত তাড়াতাড়ি তার ডাক আসতো না।

উঠে দাঁড়ায় সব্যসাচী। ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে, মাথা ঈষৎ আন্দোলিত করে সবিতার দিকে। সবিতাও মৃদু হেসে বিদায় জানায় তাকে।

সব্যসাচী বেয়ারার পিছু পিছু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এই মুহূর্তে মনটি তার কানায় কানায় পূর্ণ। এখন থেকেই অনায়াসে সে যেন ঐ নারী রত্নটিকে একরকম তার নিজের বলেই ভাবতে পারে। এই ভাবনা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হলেও গর্হিত নয়। বরঞ্চ বলা চলে অবশ্যম্ভাবী কোন কিছু সম্পর্কে পূর্ব-প্রস্তুতি। দাবী-সনদের অগ্রিম প্রয়োগ। অন্যপক্ষের পরিচয়ের অজ্ঞতাটুকু যেন সেই সনদের ওপর এক সূক্ষ্ম আবরণ। আর এই আবরণটুকুই যেন শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছে সেই দাবী-সনদের মূল্য।

ছোট সাহেব সজল মিত্র প্রথমটায় কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন সব্যসাচীর মুখের দিকে। পরক্ষণেই হাসি মুখে একটা বিস্ময় সূচক শব্দ করে বলে ওঠেন, আরে সব্যসাচী যে! কি আশ্চর্য! আমি ভাবলাম লন্ডন থেকে আবার কোন্ এস, বাসু এলো। তা, এই সময় হঠাৎ কোত্থেকে? তা'ছাড়া আমি যে এই অফিসে আছি তা-ই বা জানলে কেমন করে? সেই মুহূর্তে অফিসের কেউ যদি তাদের এই ছোট সাহেবের ঘরে থাকতো তা'হলে হয়তো সে তাজ্জব বনে যেত সজল মিত্রর মুখের হাসি ও তার কথা বলার ধরন দেখে। অফিসে একসঙ্গে এতগুলো কথা বোধহয় তিনি কখনও কারুর সঙ্গে বলেন নি। তা'ছাড়া, তাঁর এই মুখের হাসিটি তো এক বিরল বস্তু।

সজল মিত্রর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসতে বসতে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে জবাব দেয় সব্যসাচী, সেই বিলেত থেকে ফিরে এসে তুমি আর কোন খবরই নিলে না আমার। তোমার ফিরে আসার প্রায় দু'বছর পরে আমি ফিরলাম। বিলেত থেকে তোমাকে কয়েকটা চিঠিও দিয়েছিলাম, একটারও জবাব পাই নি। ভাবলাম, তুমি

হয়তো দেশের মাটিতে পা দিয়েই সংসারের চাকায় আটকে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছ। তাই—

সব্যসাচীর কথা শেষ হবার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় হৈ-হৈ করে ওঠেন সজল মিত্র, বিশ্বাস করো, যতদূর মনে পড়ে তোমার একটামাত্র চিঠি পেয়েছিলাম লন্ডন থেকে। সেটার জবাবও দিয়েছিলাম।

—যাক্‌গে ওসব পুরানো কথা। সজল মিত্রর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে বেশ আরাম করে চেপে বসে জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী, কেমন আছো, বলো।

—খারাপ দেখছো কি? ভালোই তো আছি। জলভরা মেঘের ফাঁকে উঁকি দেওয়া সূর্যের মত স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়ে জবাব দেন সজল মিত্র।

—না, খারাপ নয়। তবে একটু যেন শুকিয়েছ।

তেমনি হেসে জবাব দেন সজল মিত্র, এদেশের জল-হাওয়ার দোষে বোধহয়। তা, তুমি এখন কোথায় আছো? ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে ব্যাবসাপত্তর করছো নাকি? বিলেতে থাকতে তাই তো তুমি বলতে।

—না দাদা, তা' আর হলো কোথায়? চাকরি করছি। অবশ্যি নাম-ডাক আছে এই ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মটির। বলেই সব্যসাচী ফার্মের নামটা বললে।

নাম শুনেই সজল মিত্র বলে ওঠেন, গুড্ গড্, ঐ ফার্মের ইঞ্জিনীয়ার তুমি? তা'হলে তো বেশ তোফাই আছো।

সব্যসাচীও হেসে বললে, তুমিও বা কম কিসে, সজলদা? তোমার এই সওদাগরী ফার্মেরও তো যথেষ্ট নাম আছে।

—তা' আছে, মাথা নেড়ে সায় দেন সজল মিত্র, কিন্তু কি জানো ভাই, কেন যেন ঠিক্ মানিয়ে নিতে পারছি না। কেবলই মনে হয় এসব ছেড়েছুঁড়ে কোথাও পালাই।

—সেকি সজলদা, কৃত্রিম বিস্মিত কণ্ঠে বলতে থাকে সব্যসাচী, বিবাগী হতে চাও নাকি?

—না, ঠিক্ তা' নয়, হেসে বলতে থাকেন সজল মিত্র, বড় অফিসের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাথার ওপর বসে থাকা যে কি ঝক্মারী ব্যাপার তা' যে না বসেছে সে বুঝতে পারে না। সর্বদাই কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা। প্রাণ খুলে কথা বলা কিম্বা মেলামেশা করার সুযোগ একেবারেই নেই। মন যা স্বাভাবিকভাবে চায় তা' করার উপায় থাকে না। একজন জুনিয়র ক্লার্কের যতটুকু স্বাধীনতা এখানে আছে অফিস-বসের বোধহয় তা-ও নেই।

জবাবে সব্যসাচী বললে, তোমার কথা ঠিক্ মানতে পারছি না, সজলদা।

প্রাণখুলে মিশতে কিম্বা কথা বলতে কে তোমাকে বারণ করছে ?

—কেউ বারণ করছে না ঠিকই, কিন্তু তা' সম্ভব নয়। অফিস এটিকেট নীচু স্তরের চাইতে উঁচু স্তরের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। তা' ছাড়া, অফিস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক্ রাখতে হলে নিজেকে একটু সরিয়ে রাখতেই হয়।

সজল মিত্রর কথা শেষ হতেই সব্যসাচী হেসে উঠে বললে, ঠিক্—ঠিক্, এতক্ষণে মনে পড়েছে। এটিকেট সম্পর্কে তুমি তো বরাবরই একটু নীতিবাগীশ বলে পরিচিত ছিলে। লণ্ডনে থাকতে এই এটিকেট নিয়ে কত তর্ক করেছি তোমার সঙ্গে। এ ব্যাপারে তুমি বরাবরই একটু কড়া প্রকৃতির। সেই জন্যেই তো আমরা বলতাম এটিকেট, ডিসিপ্লিন প্রভৃতি ব্যাপারে তুমি যখন এত স্পর্শকাতর তখন তোমার ভারতবর্ষে ফিরে না গিয়ে বিলেতেই বাস করা উচিত। তাই না সজলদা ?

সজল মিত্র কোন জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসেন। তারপর একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, আমি যে এই অফিসে আছি তা' তুমি জানলে কেমন করে ?

সজল মিত্রর প্রশ্নে একটু হক্চকিয়ে যায় সব্যসাচী। এধরনের প্রশ্নের কথা তার আগে মনে হয় নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে সে জবাব দেয়, ফুলের গন্ধ যে আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, সজলদা।

সজল মিত্র জবাব দেন, পাঁকের গন্ধেরও কিন্তু তেমনি দশা।

—এটা কিন্তু তোমার স্রেফ বিনয়, সজলদা। প'াক হাতে যাবে কেন তুমি ?

—আমার এই অফিসের অনেকে কিন্তু আমাকে তাই মনে করে।

সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার ছোট জামাইবাবু কিন্তু তোমাকে প'াক বলেন নি, বলেছেন রামগরুড়ের ছানা।

মুখে বললে, তা' বোধহয় তোমার এই কড়া মেজাজের জন্যে।

সজল মিত্র ততক্ষণে নিজের প্রশ্ন থেকে অনেকদূর সরে এসেছেন। কাজেই সব্যসাচীও হ'াফ ছেড়ে ব'াচে। যাক্, আর মিথ্যে বলতে হলো না।

সহসা সজল মিত্রর টেবিলের ওপর রক্ষিত ইন্টারকমের স্পীকারে ভেসে ওঠে একটি নারী কণ্ঠ, এক্সকিউজ মী, স্যার। নন্দ এ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে লোক এসেছে সেই জরুরী চিঠিটা নিয়ে যাবার জন্যে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠেন সজল মিত্র। একটু আগের সেই হাল্কা মেজাজটুকু অদৃশ্য হয়ে যায়। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন তিনি, চিঠিটা রেডি আছে তো ?

জবাব আসে নারী কণ্ঠে, না স্যার। ড্রাফ্টা আপনি আর একবার দেখবেন বলেছিলেন। তাই ওটা এখনও টাইপে পাঠানো হয় নি।

—আই এ্যাম রিয়েলি সরি, বলে ওঠেন সজল মিত্র, ব্যাপারটা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

—ড্রাফ্টা পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে ?

— পাঠিয়ে দেবেন ? না—না, আপনি নিজেই একবার গোটা ফাইলটা নিয়ে আসুন আমার কাছে।

কথা শেষ হতেই সজল মিত্র সব্যসাচীকে বললেন, একমিনিট বসো ভাই। আমি একটা জরুরী কাজ দু'মিনিটের মধ্যে সেরে নিচ্ছি।

ইন্টারকমের নারী কণ্ঠকে চিনতে ভুল হয় নি সব্যসাচীর। সবিতা আসছে। তাই সে একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে।

সুইং ডোর ঠেলে একটা ফাইল হাতে ভেতরে ঢোকে সবিতা। সব্যসাচী নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সবিতার প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি লক্ষ্য করতে থাকে নিজের তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ অনুভূতি দিয়ে।

সবিতা সজল মিত্রের সামনে মেলে ধরে একটা মোটা ফাইল। সজল মিত্র দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন সেটার ওপর। খস্ খস্ করে কি যেন লেখেন। তারপর সেটা বন্ধ করে সবিতাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, এখনই এটা টাইপে পাঠিয়ে দিন।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সবিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, তোমার অফিসের রিসেপ্‌শনিস্টকে কি অফিসের কাজও করতে হয়, সজলদা ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জবাব দেন সজল, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

সবিতা সম্পর্কে আরও কিছু কথা সজল মিত্রকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল সব্যসাচীর, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলালো না। তাই সে প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করে, তোমার কোয়ার্টার কোথায়, সজলদা ?

সজল মিত্র তাঁর বাসার ঠিকানা বলতেই সব্যসাচী আবার প্রশ্ন করে, তোমার মিসেসও নিশ্চয়ই ওখানে আছেন ?

মাথা নেড়ে জবাব দেন সজল মিত্র, না।

—তবে কোথায় আছেন তিনি ? কৌতূহল বেড়ে ওঠে সব্যসাচীর।

একটু মুচকি হেসে সজল মিত্র আঙ্গুল দিয়ে ওপরের দিকে নির্দেশ করেন।

—তার মানে ? সব্যসাচীর কণ্ঠে কৌতূহলের সঙ্গে এবার উদ্বেগ।

তেমনি মুচকি হেসে সজল আবার জবাব দেন, না—না, স্বর্গে যান নি তিনি। ঈশ্বর এখন পর্যন্ত তেমন ব্যবস্থাই করেন নি।

—সেকি, এখনও বিয়ে করো নি তুমি ?

—তেমন সুযোগ আর পেলাম কোথায় ?

—বিয়ে করার সুযোগই পাও নি ?

এবার উল্টে সজল মিত্র জিজ্ঞেস করেন, তুমি বিয়ে করেছ ?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় সব্যসাচী, এখনও করি নি। তবে—

—দেখাশোনা চলছে, কেমন ?

সব্যসাচী জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে। সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারছিল না যে সজলদা তাঁর অফিসের রিসেপ্‌শনিস্ট সবিতার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন কিনা।

সজল মিত্র হঠাৎ বলে ওঠেন, যাক্ গে ওসব কথা। এবার বলো কি খাবে ? হট্ অর কোল্ড। কফি কিম্বা কোল্ড ড্রিংক।

—এই গরমে কোল্ডই ভালো, সজলদা।

সজল মিত্র বেল টিপ্‌তেই তাঁর খাস বেয়ারা এসে হাজির হয়। বেয়ারাকে দু'টো কোল্ড ড্রিংক আনতে হুকুম দিয়ে সজল মিত্র আবার আগের কথার জের টেনে জিজ্ঞেস করেন, বিয়ে ঠিক্ হয়েছে ?

সরাসরি মিথ্যে বলে সব্যসাচী, না, ঠিক্ এখনও হয় নি।

—তা'হলে বোঝা গেল কোর্টশিপ নয়, বাপ-মা দেখেশুনে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, কেমন ? সেই পুরানো ব্যবস্থা।

—কেন, তুমি নিজে নতুনের ভক্ত নাকি ? হেসে জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

জবাব দেন সজল, এই বয়সে ?

—এসব ব্যাপার কি সব সময় বয়সের হাত ধরে চলে ?

সজল কিছু জবাব দেবার আগেই বেয়ারা দু'টো কোল্ড ড্রিংক নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে কথা বলতে থাকে তারা। এবার তাদের চাকরির গল্প। সব্যসাচীর চাকরি নতুন হলেও সজল মিত্রর এটা তৃতীয়। কি অবস্থার আগের দু'টো চাকরি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সেই কাহিনীই সবিস্তারে বলতে থাকেন তিনি।

বাস্তবিকই অভিনব ব্যাপার। একজন ভিজিটরের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে ছোট সাহেবকে এর আগে কেউ কখনও দেখে নি। তার ওপর গোটা অফিসে বেয়ারা মারফত খবর ছড়িয়ে পড়লো যে তাদের ছোটসাহেব কেবল ভিজিটরটির সঙ্গে চুটিয়ে গল্পই করছেন না, সেই সঙ্গে হাসছেনও। এটা একটা খবরের মত খবরই বটে।

সারা অফিস জুড়ে আলোচনা। ছোটসাহেব হাসছেন। তার চাইতেও বেশি কৌতূহল ঐ ভিজিটরটি সম্পর্কে। গোমড়ামুখো সাহেবের মুখে যিনি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি নিশ্চয়ই কোন কাস্টমার নন্। হয়তো সাহেবের কোন আত্মীয় হবেন, কিম্বা কোন বন্ধু। কিন্তু অনেক জেরা করেও বেয়ারার কাছ থেকে এর বেশি কোন খবর যোগাড় করা গেল না। সে কেবল বললে, তা' কি করে বলবো ? তবে ছোটসাহেব খুব গল্প করছেন আর হাসছেন। দরজার বাইরে বসে আমি তার হাসির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

এক সময় সব্যসাচী বলে ওঠে, আজ তোমার কাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, সজলদা। তুমি যেমন কাজ-পাগলা মানুষ, মনে মনে বোধহয় এইজন্যে আমাকে গালাগাল দিচ্ছ।

হেসে জবাব দেন সজল, বেশ তো, গালাগালই না হয় দিচ্ছি। এমনি গালাগাল খেতে কবে আবার এখানে আসছো তা-ই বলো।

—আস্‌বো, সময় পেলেই আবার আসবো। বলতে বলতে হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সব্যসাচী।

—হোপ টু সি ইউ এগেন। সজল মিত্রও হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

সব্যসাচী আবার বললে, আমার অফিসে তোমাকেও কিন্তু একদিন এক্সপেক্ট করছি, সজলদা।

—ডেফিনিটলি। মাথা নেড়ে সায় দেন সজল মিত্র।

অফিসের লম্বা করিডোর ধরে একতলার সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সবিতার ঘরের দিকে চোখ পড়ে সব্যসাচীর। সবিতা বোধহয় ঘরেই আছে। হয়তো আপন মনে বসে বসে কাজ করছে। সে একবার যাবে নাকি ঐ ঘরে? জাস্ট, একবার ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া, আর সেই সুযোগে আর একবার তাকে দেখা। থাক্, দরকার নেই। সন্দেহ করতে পারে। আর দিন কয়েক মাত্র পরে যে তার জীবন সঙ্গিনী হতে চলেছে তাকে এইমুহূর্তে আর একবার দেখার লোভ না হয় সে সংবরণ করলো। সামনে তো দেখার দিন পড়েই রয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে নিজের ওপরই খুশি হয়ে ওঠে সব্যসাচী। কারুর মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই সে এখান থেকে ঘুরে গেল। তার সজলদা নিশ্চয়ই কিছু টের পান নি। পেলে তিনি ঐ সম্পর্কে কিছু না কিছু অবশ্যই জিজ্ঞেস করতেন। সজলদা তাকে স্নেহ করেন। তাঁর অফিসের রিসেপশনিস্টের সঙ্গে সব্যসাচীর বিয়ের খবর জানতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হতেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁর মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ দেখা দিত যে পাত্রী সবিতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়াটাই তার এই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য। আর সেটা হতো তার সন্দেহাকুল মনের পরিচয়। পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে গোপনে খোঁজ-খবর নিতে তাদের কর্মস্থলে যাওয়া একটা স্বীকৃত ব্যাপার হলেও পাত্র-পাত্রীর তরফে এটাকে কেউ তেমন ভালো চোখে দেখে না। বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী নিজেরা তো নয়ই। এটা যেন তাদের কথা অবিশ্বাস করে পেছনে গোয়েন্দা লাগানোর মত একটা ব্যাপার।

(সাত)

জন্ম-মৃত্যুর মত বিয়েও অধিকাংশ মানুষের জীবনে একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। সংসারে প্রতিনিয়তই এই ঘটনা ঘটেছে, তবুও এ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের যেন শেষ নেই। বিয়ের কথা শুনলেই মানুষের কান খাড়া হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মেয়েদের তো বটেই। বিয়ের মধ্যে যে রোমান্টিকতা লুকিয়ে থাকে তার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ। অশীতিপর বৃদ্ধও এ থেকে মুক্ত নন। একজোড়া নবদম্পতীকে চোখের সামনে দেখলে একজন বৃদ্ধের মনটাও খুশি হয়ে ওঠে। এই রোমান্টিকতা থেকেই জন্ম নেয় কৌতূহল।

সবিতার ধারণা তার বিয়ের খবর অফিসের কেউ জানে না। সবিতা অফিসে কারুর সঙ্গে তেমন একটা মেলামেশা করে না। যদি করতো তা'হলে টের পেত যে অফিসের ঝাড়ুদার থেকে বড় সাহেব পর্যন্ত কারুরই আর একথা জানতে বাকি নেই।

না, এজন্যে কিন্তু ছোট সাহেব সজল মিত্রকে দায়ী করা চলে না। সব্যসাচীর ছোট জামাইবাবু সন্দীপের কাছ থেকে খবরটা জানতে পেরেছিলেন বলে তিনি অবশ্যই এটা অফিসে ছড়ান নি। অফিসের একজন কর্মচারীর বিয়ের বিষয় নিয়ে কৌতূহল দেখাবার মত হালকা স্বভাব তাঁর নয়। খবরটা ছড়িয়েছিল তাঁরই খাস বেয়ারা পরমেশ। সেদিন দরজার পাশে বসে ছোট সাহেবের সঙ্গে সন্দীপের কথাবার্তার প্রায় সবটাই সে শুনতে পেয়েছিল। এমনকি কফি নিয়ে ঘরে ঢোকার মুখে সন্দীপের মুখেই সে শুনতে পেয়েছিল যে পি. জি. হাসপাতালের বড় ডাক্তার এস. বোসের একমাত্র ইঞ্জিনীয়ার ছেলের সঙ্গেই নাকি সবিতা দিদিমণির বিয়ে।

কথাটা সে সর্বপ্রথম বলেছিল স্টোর কীপার অমল বাগচীকে। বেয়ারা পরমেশের সঙ্গে অমলের খাতির বরাবরই একটু বেশি। সময় পেলেই পরমেশ এসে গল্প করে বাগচী মশাইয়ের সঙ্গে। তাকে খুশি করে পরমেশ মাঝে-মধ্যেই স্টোর থেকে এটা-ওটা হাতিয়ে নেয়। সেই সূত্রেই এই ঘনিষ্ঠতা।

পরমেশের মুখে কথাটা শুনে কৌতূহলী হয়ে ওঠে অমল বাগচী। জিজ্ঞেস করে পরমেশকে, তুই নিজে শুনেছিস্ ?

—হ্যাঁ বাবু, বলতে থাকে পরমেশ, আমি নিজের কানে শুনেছি। আচ্ছা বাবু, বিয়ে হয়ে গেলে দিদিমণি কি আর চাকরি করবে ?

—তা' দিয়ে তোর দরকার কি ? একটা অশুভ খবর শুনলে মানুষ যেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে তেমনি বিরক্ত কণ্ঠে পরমেশকে ধমকে উঠেছিল অমল। হঠাৎ বাবুর মেজাজটা কেন বিগড়ে গেল বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে পড়েছিল পরমেশ।

সবিতার বিয়ে নিয়ে সারা অফিসে আলোচনার ঢেউ, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার এতটুকু উপায় নেই। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত কর্মচারীদের টেবিলের আনাচে-কানাচে, করিডোরে, ক্যান্টিনে এই আলোচনার তরঙ্গ কিন্তু রিসেপশন রুম পর্যন্ত পৌঁছয় না। সবিতা আপন মনে ডুবে থাকে কাজের মধ্যে। হাতে কাজ না থাকলে বসে বসে ইংরেজি-বাংলা মাসিকপত্র পড়ে। কাজেই কোন কিছুই জানতে পারে না সে। তবে অফিসে যাতায়াতের সময় সহকর্মীদের চোখের দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন এক নতুনত্বের আভাস মেলে। বিশেষ করে, অফিসের কোন কোন মহিলা কর্মীর মুখের চাপা হাসি ও তির্যক দৃষ্টির সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে সময় সময় কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কিন্তু তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না সে।

সবিতাকে নিয়ে আলোচনায় অফিসের পুরুষ মহলের চাইতে মেয়ে মহলই বেশি উৎসাহী। কেউ কেউ ঠোঁট উল্টে বলে, হতে পারে ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু কি ধরনের ইঞ্জিনীয়ার সেটাই আগে জানা দরকার। যা দিন-কাল তাতে তো ছুতোর মিস্ত্রীও নিজেকে ইঞ্জিনীয়ার বলে পরিচয় দেয়। ডিপ্লোমা-ডিগ্রী সবই তো এযুগে একাকার।

কেউ হয়তো মৃদু প্রতিবাদ করে, না—না, অমন আণ্ডার-এস্টিমেট করিস না। অত বড় ডাক্তার বাপের ছেলের পক্ষে আসল ইঞ্জিনীয়ার হওয়াই সম্ভব। তা'ছাড়া বিলেত ঘুরে এসেছে।

—বিলেত যাওয়াটা কি এ যুগে কোন একটা শক্ত ব্যাপার ? পয়সা থাকলে যে-কেউ সেখানে যেতে পারে।

—তা অবশ্য পারে, তর্ক এড়াতে গিয়ে সেই প্রতিবাদকারী[illegible] পলায়নপন্থা[illegible] করতে বাধ্য হয়।

খবরটা শোনার পর থেকে স্টোর কীপার অম[illegible] [illegible] [illegible] কেমন যেন খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। [illegible] কুশলবার্তা [illegible]জ্ঞেস করতে প্রতিদিন সবিতার ঘরে যেতে আর তেমন উৎসাহ[illegible] [illegible] না [illegible] আশ্চর্য মানুষের মন। সে কি আশা করেছিল যে [illegible] ধরে [illegible] ভাবে সবিতার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে যাবে [illegible] [illegible]তার মনের [illegible] কোন গোপন প্রকোষ্ঠে এমন একটা কিছু লুকিয়ে ছি[illegible] [illegible] সবিতার [illegible] খবরে আঘাত পেয়ে অভিমান জাতীয় কোন এক বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিল?

খবরটা কানে যেতেই একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অরুণ রায় পুরো একটি ঘণ্টা নিজের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এই সময়ের মধ্যে সে কাগজের ওপর কলম দিয়ে যেমন একটি আঁচড়ও কাটেনি তেমনি দশ-পনেরো মিনিট অন্তর পকেটের চিরুণী বের করার অভ্যেসটাও যেন সাময়িক ভাবে ভুলে বসেছিল। তার রকম-সকম দেখে পাশের কনিষ্ঠ কেরাণীটি অবশেষে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, কি হলো, অরুণদা? ধ্যান করছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে উল্টে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে করুণ কণ্ঠে সে বলে উঠেছিল, না ভাই, কিছু না। বুকটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠ্‌লো।

—হার্টের ট্রাব্‌ল আছে নাকি? হাসি চাপতে গিয়ে অতিরিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল সেই জুনিয়র কেরাণীটি।

সেই মুহূর্তে অরুণ রায় করুণ দৃষ্টিতে এমনভাবে কেবল তাকিয়েছিল সেই কনিষ্ঠের দিকে যার একমাত্র অর্থ—আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!

সবিতার বিয়ের খবর কানে যেতে সবচাইতে সরব হয়ে উঠেছিল সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট দিব্যেন্দু সান্যাল। জ্যা-ছেড়া ধনুকের মত হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে ছিট্‌কে সরে গিয়ে বলে উঠেছিল, বলছো কি? সবিতার বিয়ে? কোন্ সবিতা? আমাদের সবিতা?

—আমাদের না তো কি? তা'ছাড়া এই অফিসে আর ক'টা সবিতাই বা আছে?

—হুঁ, মুখে শব্দটা উচ্চারণ করে নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল দিব্যেন্দুর। তারপর, নিজে জাহানারার ভূমিকা গ্রহণ করে চোখের সামনে ঔরঙ্গজীবকে কল্পনা করে নিয়ে জাহানারার সেই ডায়লগটি হুবহু মুখস্ত বলে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ঔরঙ্গজীব বিশ্বাসঘাতক। তবে

উরূপী সবিতা সম্পর্কে দিব্যেন্দুর দেওয়া এই বিশেষণটির আসল কারণ দিব্যেন্দুর নাট্যসংস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে সবিতার অনীহা কিম্বা এর পেছনে অন্য কোন কারণ লুকিয়েছিল তা' কিন্তু বলা শক্ত।

এ ব্যাপারে গোটা অফিসে বোধহয় সব চাইতে বেসামাল হয়ে পড়েছিল জুনিয়র ক্লার্ক রথীন চ্যাটার্জী। পুরো তিনটি দিন অফিসে অনুপস্থিত ছিল সে। অবশেষে চতুর্থ দিন যখন সে অফিসে এলো তখন তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, গালে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল, কিহে, বিনে নোটিশে কোথায় ডুব দিয়েছিলে?

জবাবে বলেছিল রথীন, বাড়িতে।

—বাড়িতে?

—হ্যাঁ, বাড়িতে বসে রাতদিন কেবল কবিতা লিখেছি।

—রাতদিন কেবল কবিতা?

—হ্যাঁ, মোট তেত্রিশটা।

—তার মানে, রোজ এগারোটা করে?

—না। প্রথম দিন উনিশটা, দ্বিতীয় দিন দশ, আর গতকাল মাত্র চারটি।

—বাঃ, চমৎকার ইমপ্রুভমেণ্ট। এখন তো তোমাকে বেশ সুস্থই দেখছি। আজ বোধহয় আর কবিতা লেখার প্রয়োজন হবে না?

এবার আর কোন জবাব না দিয়ে অফিসের একটা মোটা ফাইল নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল রথীন।

বিয়ের আর দিন দশেক মাত্র বাকি। ভবানীপুর আর শোভাবাজার—দুই বাড়িতেই বিয়ের সাজ সাজ রব। স্বাভাবিক কারণেই পাত্রীর বাড়ি শোভাবাজারে কর্মচাঞ্চল্য কিছু বেশি। এখানে বাসন্তীই সব। পুরুতঠাকুরের দেওয়া বিয়ের ফর্দ থেকে শুরু করে রান্নার ঠাকুরের ফর্দ পর্যন্ত সবই একা তাঁকে জোগাড় করতে হচ্ছে। তার ওপর সোনাদানা কাপড়-চোপড় কেনাকাটা তো আছেই। নিঃশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় নেই তাঁর। মাঝে মাঝে নিভাননী উদ্বেগাকুল কণ্ঠে পুত্রবধুকে বলেন, এত খাটাখাটনি করো না, বৌমা। অসুখ-বিসুখ করলে বিপদের আর শেষ থাকবে না। বাসন্তী কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে কেবল নিজের কাজ করে যেতে থাকেন। পবিত্র কিন্তু নিশ্চিন্ত। স্ত্রীর ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর কোর্ট-কাছারী নিয়েই আছেন।

ভবানীপুরের বাড়িতে সব্যসাচীর ছোট জামাইবাবু সুদীপই দেখাশোনা করছেন সবকিছু। হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত। হুলুস্থুলু পড়ে গেল সেখানে। উপলক্ষ্য এই চিঠিখানা—

৪/৭/৮০

মহাশয়,

আপনি আপনার পুত্রের জন্য শোভাবাজারের যে পাত্রী পছন্দ করিয়াছেন সেই পাত্রী সম্পর্কে খোঁজ-খবর করিয়াছেন কি? আমার মনে হয় করেন নাই। করিলে এ পাত্রী কিছুতেই পছন্দ করিতেন না।

পাত্রী রূপবতী ঠিকই, কিন্তু ঐ রূপের দ্বারা সে যে কি কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে তাহা শুনিলে আপনি কানে আঙুল দিবেন। ভদ্র ঘরের ও শিক্ষিত পরিবারের একটি মেয়ের পক্ষে যাহা কল্পনার অতীত তাহাই সে করিতেছে। কেবলমাত্র বিবাহের একটি ছাপের প্রয়োজন হওয়ায় সে আপনার পুত্রের ঘাড়ে ভর করিতে যাইতেছে। আমি আপনাদের পরিবারের শুভার্থী তাই এই খবর জানাইলাম।

নিজের পুত্রের মঙ্গল বিবেচনায় একটু সাবধান হইবেন। ইতি

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।

এমনিতে বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট হলে কি হয়, বেলা দু'টোয় বাড়ি ফিরে সব্যসাচীর বাবা সর্বেশ্বর বোস চিঠিখানা পেয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তাঁর নিজের হার্টটিই বোধহয় ঠিক মত কাজ করছিল না। এসব সাংসারিক ব্যাপারে ভয়ানক নার্ভাস তিনি। স্ত্রী লাবণ্যময়ী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, ওকি, অমন করে রইলে কেন? কার চিঠি ওটা? কি আছে ওতে?

স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে সর্বেশ্বর বিড় বিড় করে কি বললেন ঠিক বোঝা গেল না। লাবণ্যময়ী স্বামীর কাছে সরে এসে তাঁর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতে থাকেন। পরক্ষণেই পাশের সোফায় অবসন্নের মত হেলে পড়ে এস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, এ কি সর্বনেশে কথা! এখন কি হবে?

হার্ট স্পেশালিস্ট সর্বেশ্বর বোধহয় ততক্ষণে নিজের হার্টটিকে খানিকটা চাঙ্গা করে নিয়েছেন। স্ত্রীর অবসন্ন আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সোফার ওপর পড়ে যাওয়া চিঠিখানা তুলে নিয়ে আবার একবার পড়েন। তারপর চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, একবার খবর দাও। এখনই একবার আসতে বলো ওকে।

—কাকে? লাবণ্যময়ী তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে।

জবাব দেন সর্বেশ্বর, কাকে আবার, সুদীপকে। এসব ব্যাপারে ও-ই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

সুদীপ চাকরি করেন না, ব্যবসা করেন। কাজেই শাশুড়ি-ঠাকুরণের টেলিফোন পেয়েই তিনি কলকাতার ট্রাফিক কনস্টেবলদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হন।

ঘরে ঢুকতেই তাঁর চোখে পড়ে সর্বেশ্বর ও লাবণ্যময়ী পরস্পর মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সামনে নীচু টেবিলের ওপর পেপারওয়েট চাপা ইনল্যান্ড চিঠির একাংশ সিলিংপাখার হাওয়ায় পুচ্ছতুলে ময়ূরের মত নাচছে।

টেলিফোনেই লাবণ্যময়ীর কাছ থেকে মোটামুটি চিঠির বয়ান জানতে পেরেছিলেন সুদীপ। নিঃশব্দে তিনি এসে শ্বশুরের পাশে বসেন। তারপর টেবিল থেকে তুলে নেন চিঠিখানা।

সাধারণ ইনল্যান্ড চিঠি। একটা পাশ সাদা। অন্যপাশে কেবল লেখা। লেখকের নাম নেই। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর আড়ালে লুকিয়ে আছেন তিনি। উপরের তারিখটা যদি ঠিক হয় তা'হলে বোঝা যায় যে মাত্র দু'টো দিন আগে পরোপকারী এই লেখক চিঠিখানা ডাকে দিয়ে এই পরিবারটির শুভাশুভ আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

সুদীপ চিঠিটা হাতে নিয়ে বেশ কয়েকবার পড়েন। অবশেষে সেখানা উল্টে

নিয়ে গভীর মনোযোগে পোস্ট অফিসের সীলমোহরটি পরীক্ষা করে ডাকঘরের নামটি উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন।

তবে তাঁর সেই চেষ্টাই সার। সীলমোহর থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেন না সুদীপ। এসব ব্যাপারে ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ বড়ই সচেতন। চিঠির ওপর তাঁরা শীলমোহরটি এমনভাবে অঙ্কিত করেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পোস্টাল অথরিটি বোধহয় ডাকঘরের নাম জনসাধারণকে জানাতে খুবই কুণ্ঠিত। তাই এই ব্যবস্থা।

শ্বশুর মশাই ও শাশুড়ি ঠাকুরণ এতক্ষণ বসে বসে ছোট জামাইয়ের কাজ কারবার দেখছিলেন। সুদীপ বিরক্ত ভঙ্গিতে চিঠির ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাতেই শ্বশুর মশাই জিজ্ঞেস করেন, কিছু বুঝতে পারলে ?

—আজ্ঞে না। জবাব দেন সুদীপ

—তা'হলে এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখলে ?

—ডাকঘরের নামটা পড়া যায় কিনা তা-ই দেখছিলাম। কিন্তু পড়া গেল না। তবে 'কলকাতা' শব্দটা পড়তে পেরেছি।

—ডাকঘরের নামটা পড়তে পারলেই কি লেখককে চিনিতে পারবে বলে মনে করছো ?

—না, তা' ঠিক নয়। লেখক নিজের বাড়ির কাছের ডাকবাক্সে চিঠি না ফেলে দূরের কোন পোস্ট অফিস থেকেও এটা পোস্ট করতে পারে।

—দ্যাট্‌স রাইট। গম্ভীর কণ্ঠে শব্দ দু'টো উচ্চারণ করে চুপ্‌ করে থাকেন সর্বেশ্বর।

আবার নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে। ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী বিভোর হয়ে থাকেন আপন আপন চিন্তায়।

একসময় নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে লাবণ্যময়ী ভারী কণ্ঠে বলে ওঠেন, এবার তবে কি হবে ? কে এমন সর্বনাশ করলো ?

জবাব দেন সুদীপ, সর্বনাশ ভাবছেন কেন, মা ? এমনও তো হতে পারে এটা আমাদের পক্ষে অশীর্বাদ।

—আশীর্বাদ ? প্রশ্ন করেন সর্বেশ্বর।

সুদীপ জবাব দেবার আগেই পাশের টেলিফোন ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে বেজে ওঠে। সর্বেশ্বর হাতে বাড়িয়ে টেলিফোন ধরতেই পি. জি. হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেণ্টের একজন ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আপনার পক্ষে কি পাঁচটা নাগাদ একবার হাসপাতালে আসা সম্ভব হবে, স্যার ?

সেই মুহূর্তে দারুণ বিরক্তি বোধ করেন সর্বেশ্বর। জবাব দেন তিনি, না, সম্ভব নয়।

—তা'হলে কি একটু দেরি হবে, স্যার ?

এবার স্পষ্ট বিরক্তির সুর ফুটে ওঠে সর্বেশ্বরের কণ্ঠে। জবাব দেন তিনি, নো—নো, সম্ভব নয়। আজ বিকেলে হাসপাতালে একেবারেই যাবো না আমি। কথা শেষ করেই সশব্দে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বলে ওঠেন, আমি মরছি আমার জ্বালায়!

তারপর সন্দীপের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি ? আশীর্বাদ ? এই চিঠিটা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ ?

জবাব দেন সন্দীপ, জোর করে বলতে পারছি না। তবে আশীর্বাদ হতেও পারে। আমাদের সাবধান করে দিয়ে হয়তো ভালই করেছে। যা দিন-কাল, বলা তো যায় না কিছু।

এবার লাবণ্যময়ী জিজ্ঞেস করেন তাঁর ছোট জামাইকে, তোমার কি মনে হয়, বাবা ? কেউ ভাঙ্‌চি দেবার জন্যেই কি এই চিঠি লিখেছে ?

—নিশ্চয়ই। বলতে থাকেন সন্দীপ, তা' না হলে বিয়ের মাত্র কয়েকটা দিন আগে এমন চিঠি লেখার অর্থ কি ?

সর্বেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, কে এমন চিঠি লিখতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

একটু সময় চিন্তা করে জবাব দেন সন্দীপ, দেখুন কে যে লিখেছে তা' এই মুহূর্তে বলা শক্ত। তবে এটা ঠিক্ যে-ই লিখে থাকুক তার একান্ত ইচ্ছে যে এই বিয়ে যেন না হয়।

—কে এমন লোক হতে পারে ?

—ওদের পরিবারের কেউ হতে পারে। তা'ছাড়া—

—তা'ছাড়া কি ?

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন সন্দীপ। তারপর বললেন, দিন-কাল বড়ই খারাপ। এযুগের ছেলে-মেয়েদের মনের কথা টের পাওয়া শিবেরও অসাধ্য। এমনও তো হতে পারে যে পাত্রীর কোন পুরুষ বন্ধুরই এই কাজ।

—তাতে তার লাভ ?

—হয়তো পাত্রীর এখানে বিয়ে হয় তা' সে চায় না। পাত্রীর দাদা-বৌদিকে অনুরোধ করে বিফল হয়ে অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে হয়তো সে এই পথ বেছে নিয়েছে।

—তার মানে, তুমি বলতে চাইছো, পাত্রী তাকে রিফিউজ করেছে বলে সে এই পথ অবলম্বন করেছে ?

—হ্যাঁ, হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে পাত্রীর সঙ্গে যুক্তি করেই সে এ-কাজ করেছে। এতে পাত্রীর সম্পূর্ণ মত আছে।

সহসা লাবণ্যময়ী বলে ওঠেন, কি সাংঘাতিক কথা! এই চিঠি না এলে আমরা তো কিছুই জানতে পারতাম না। ঐ মেয়েটিকেই ঘরে আনতে হতো।

স্ত্রীকে মৃদু ধমক দেন সর্বেশ্বর, তুমি থামো তো। মেয়েটি যে খারাপ তা' তোমাকে কে বললে? এত তাড়াতাড়ি একটি মেয়ে সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা করা ঠিক নয়।

শ্বশুর মশাইকে সমর্থন করেন সুদীপ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত সবই তো আমাদের অনুমান।

সর্বেশ্বর আবার জিজ্ঞেস করেন সুদীপকে, তোমার কি মনে হয় পাত্রীর নিজের মতের বিরুদ্ধে তার বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল? শিক্ষিতা চাকুরে মেয়ের দাদা-বৌদি কি এমন একটা কাঁচা কাজ করেছিলেন? বিশেষ করে পাত্রীর বৌদিকে তো খুব বিচক্ষণ মহিলা বলেই মনে হয়েছিল। তাঁর পক্ষে কি জেনে শুনে এমন একটা কাজ সম্ভব?

জবাবে সুদীপ বললেন, এযুগে কি যে সম্ভব, আর কি যে সম্ভব নয় বলা ভারি মুশকিল। ভেবে দেখুন, পাত্রীকে আমরা সবাই দেখেছি। অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী তার। পরিবারটি বেশ শিক্ষিত, বাইরে থেকে তো খুবই ভালো বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে কোথাও বোধহয় একটা গণ্ডগোল আছে।

স্বামীর কাছে কড়া কথা শুনে লাবণ্যময়ী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। সুদীপ থামতেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন তাঁকে, এর পরেও কি আমাদের এগোনো উচিত বলে তুমি মনে করো?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেন সুদীপ, খুঁতখুঁতে মন নিয়ে বিয়ের মত একটা ব্যাপারে এগোনো উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।

—তা'হলে কি তুমি এই বিয়ে ভেঙে দিতে বলছো?

—তা'ছাড়া আর উপায় কি বলুন? জেনে-শুনে এমন একটা কাজ করা কি ঠিক হবে? বিয়ের চিঠি তো এখনও ছাপা হয় নি, কাউকে খবরও দেওয়া হয়নি। কাজেই—

—কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই তো এই বিয়ের কথা জেনে গেছে।

—বেশ তো, তারা আবার জানবে যে এই বিয়ে যে কোন কারণেই হোক হবে না। সব্যসাচীর ভবিষ্যৎটাও তো আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

সুদীপের কথায় লাবণ্যময়ী খুশি হয়ে স্বামীকে বললেন, ও ঠিকই বলেছে। এরপরে আমাদের আর এগোনো কোনমতেই উচিত নয়।

সর্বেশ্বর কিন্তু কোন মতামত না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তারপর একসময় অনেকটা নিজের মনেই বলে ওঠেন, দারুণ সমস্যা। এই চিঠি পাওয়ার পরে আর এগোতেও তেমন সাহস পাচ্ছি না, আবার এর ওপর নির্ভর করে বিয়েটা ভেঙে দিতেও ঠিক মন সরছে না। ভাবছি কেউ যদি ওদের ওপর শত্রুতা করে এই চিঠি পাঠিয়ে থাকে তা'হলে একটি নিরপরাধ মেয়ের উপর যে ধরনের

অন্যায় করা হবে সেই অন্যায়ের ধকল সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ভাঙা মন নিয়ে সে হয়তো আর কোনদিনই সংসারী হতে পারবে না।

স্বামীর কথায় লাবণ্যময়ী বিরক্তি বোধ করেন। তিক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, কোথাকার কোন্ মেয়ে সংসারী হতে পারলো কি পারলো না তা' নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাই কেন? তোমার দেখছি সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি।

স্ত্রীর কথায় সর্বেশ্বর মৃদু হেসে বললেন, ঠিকই বলেছো। মানুষের হার্ট নিয়ে কারবার করি কিনা, তাই। কথায় বলে মেয়েরাই মেয়েদের প্রধান শত্রু। তোমার কথায় এখন মনে হচ্ছে কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়।

এবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন লাবণ্যময়ী, তা'হলে তুমি কি করতে চাও এখন? এখানেই ছেলের বিয়ে দেবে?

শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া পাকিয়ে ওঠে দেখে সুদীপ তাড়াতাড়ি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে বলে ওঠেন, আমি বলি কি, যে বিয়ে করবে তাকে একবার ব্যাপারটা জানানো হোক্। সে তো আর এখন ছোট খোকাটি নয়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার। দেশ-বিদেশ ঘুরেছে। ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বোঝার মত ক্ষমতা তার আমাদের কারুর চেয়েই কম নয়।

সুদীপের কথায় এতক্ষণে যেন একটা পথ খুঁজে পান সর্বেশ্বর। শান্ত কণ্ঠে বললেন, কথাটা মন্দ নয়।

একটু থেমে সুদীপের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলতে থাকেন, তুমিই বরঞ্চ এই ভারটা নাও, বাবা। ওর মনোভাব যাচাই করে দেখ। তারপর যা হয় ঠিক্ করা যাবে। কথাটা শেষ করেই তিনি স্ত্রীর দিকে তাকান সমর্থনের আশায়।

লাবণ্যময়ী এবার আর আপত্তি করেন না। মৃদু কণ্ঠে কেবল বললেন, বেশ, তাই করো। দেখ, ও কি বলে।

সন্ধ্যা নাগাদ সব্যসাচী যখন বাড়িতে প্রবেশ করে তখন শ্বশুর ও শাশুড়ি তাঁদের ছোটজামাইকে নিয়ে দ্বিতীয় দফায় আলোচনায় বসেছিলেন। আলোচনার বিষয়-বস্তু সেই চিঠিখানা। সব্যসাচীকে ঢুকতে দেখেই হঠাৎ থেমে যায় আলোচনা। ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ লাগলেও সেই মুহূর্তে কোন কথা না বলে সব্যসাচী সোজা চলে যায় নিজের ঘরের দিকে। আর, প্রায় তার পিছু পিছু এসে হাজির হন তার ছোট জামাইবাবু।

সুদীপ কিছু বলার আগেই সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে তাঁকে, ব্যাপার যেন কিছু গুরুতর মনে হচ্ছে?

—কেন, গুরুতরের আবার কি দেখলে? উল্টে সব্যসাচীকে প্রশ্ন করেন সুদীপ।

হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, এই সময় তো বাবা কখনও বাড়ি থাকেন না। তাই বলছিলাম, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই বোধহয় আলোচনা চলছিল।

—বিয়ের মত একটা বিষয়কে তুমি কি গুরুত্বহীন বলতে চাও নাকি? সুদীপও মৃদু হেসে বলতে থাকেন, বিশেষ করে যেখানে আমাদের অসভ্যর বিয়ে।

সব্যসাচী আর কোন কথা না বলে পকেট থেকে একখানা কাগজ, বের করে সুদীপের হাতে দিতে দিতে বললে, সেদিন লিস্ট্ দেবার জন্যে আমাকে তাড়া দিচ্ছিলেন না? এই নিন সেই লিস্ট্। সর্বসাকুল্যে আমার বন্ধু-বান্ধব হবে জনা পঞ্চাশের মত। দু একজন বাড়তেও পারে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গম্ভীর হয়ে ওঠেন সুদীপ। এই সময় চিঠির কথা সব্যসাচীকে বলতে কেমন যেন একটু বাধো বাধো ঠেকছিল তাঁর। যার বিয়ে সে উৎসাহ ভরে নিমন্ত্রিত বন্ধুদের লিস্ট্ তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। আর সে কিনা তার জবাবে ওর হাতে তুলে দেবে সেই অপয়া চিঠিটা। কিন্তু উপায় নেই। দায়িত্ব যখন তিনি নিয়েছেন তখন এই কাজটুকু তাঁকে করতেই হবে। নিষ্ঠুরের মতই করতে হবে।

সুদীপ সব্যসাচীর দেওয়া লিস্ট্টা একবার উল্টে না দেখেই ভাঁজ করে নিজের পকেটে রাখেন। তারপর তেমনি গম্ভীর সুরে বললেন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ ছিল, অসভ্য।

নিজের হাতঘড়িটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে ঘুরে দাঁড়ায় সব্যসাচী। সুদীপের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে একটু বিস্ময় বোধ করে। ছোটজামাইবাবু তো সাধারণতঃ এমন গম্ভীর হন না কখনও।

বুক পকেট থেকে সেই ইনল্যাণ্ড চিঠিটা বের করে সব্যসাচীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুদীপ বললেন, আজ দুপুরে এটা তোমার বাবার নামে এসেছে।

—কে লিখেছে? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর সব্যসাচীর।

—পড়েই দেখ না। জবাব দেন সুদীপ।

ভাঁজ খুলে চিঠিখানা পড়তে থাকে সব্যসাচী। সুদীপ কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন ওটা পড়তে পড়তে সব্যসাচীর মুখের ভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাশ হতেই হলো তাঁকে। সব্যসাচী দ্রুত চোখ বুলিয়ে বার দু'য়েক চিঠিটা পড়ে সেটা আবার জামাইবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, যত সব পাগলের কাণ্ড!

—তার মানে? প্রশ্ন করেন সুদীপ।

—মানে তো অতি সরল, হাল্কা সুরে বলতে থাকে সব্যসাচী, কেউ আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

—এটাকে তুমি ঠাট্টা বলছো? এর মূলে যে কোথায় নিহিত তা' হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না।

—পারবো না কেন? নির্বিকার সুরে বলতে থাকে সব্যসাচী, পাত্রীর কোন হতাশ পূর্ব-প্রণয়ী হয়তো এই বিয়ে ভেঙে দিতে চায়।

সব্যসাচীর খোলাখুলি কথায় কিন্তু ঘাবড়ে যান সুদীপ। সব্যসাচী যে কথাগুলো এমন সহজে উচ্চারণ করে বসবে তা' তিনি ধারণা করতে পারেন নি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সুদীপ আবার বললেন, ব্যাপারটার একটা দিক্ কেবল দেখছো কেন তুমি? এমনও তো হতে পারে এতে পাত্রীর নিজেরও সায় রয়েছে।

ভগ্নিপতির কথায় এবার হেসে ফেলে সব্যসাচী। তারপর হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, না জামাইবাবু, হলো না। আপনার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। পাত্রী লেখাপড়া জানা মেয়ে, একটা বড় ফার্মে চাকরি করে। তার যদি এখানে বিয়ে করতে আপত্তি থাকতো তা'হলে সে ব্যাপারটাকে এতদূর এগোতে কিছুতেই দিতো না।

—তা' বটে। মনে মনে সব্যসাচীর যুক্তিকে সমর্থন না করে পারেন না সুদীপ। তবুও মনের মধ্যে একটা কাঁটা কেমন যেন খচ্ খচ্ করতে থাকে। তাই তিনি আবার বললেন, আসল ব্যাপার যে কি তা' আমরা কেউই জানি না। তবে আমার মনে হয় এখানে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভালো।

গায়ের জামা খুলতে খুলতে সব্যসাচী বললে, এই ব্যাপারটার ওপর এমন গুরুত্ব দেওয়ার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না, জামাইবাবু। তবে এখানে আমার বিয়ে হবে কি হবে না সে স্বতন্ত্র কথা। এ বিষয়ে আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন।

—তোমার মা'ও এ কথাই বলেছেন। তিনিও চান না এখানে তোমার বিয়ে হোক্।

—বাবা, বাবা কি বলছেন?

—তিনি গোটা ব্যাপারটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

এতক্ষণে সব্যসাচীর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে চিন্তার ছায়া? একটু সময় চুপ্ করে থেকে সে কি যেন চিন্তা করে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, দেখুন জামাইবাবু, বিয়ের আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। এখন এই বিয়ে ভেঙে দিলে প্রকারান্তরে ঐ চিঠির সেই লেখককেই সাহায্য করা হবে।

—তাই বলে জেনে-শুনে এই ধরনের একটি মেয়েকে ঘরে আনতে হবে? অনুযোগের সুর ফুটেওঠে সুদীপের কণ্ঠে।

ছোটজামাইবাবুর কথার ধরনে হেসে ওঠে সব্যসাচী। হাসতে হাসতে বললে, না—না, এই পাত্রীকেই ঘরে আনতে আপনাদের কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? আমি মোটেই তা' বলছি না। আমি বলছি, এই চিঠিটা এটা প্রমাণ করে না, যে পাত্রীর স্বভাব-চরিত্র খারাপ।

—এমন জোর দিয়ে একথা কেমন করে বলছো তুমি? বিস্মিত কণ্ঠে বলতে থাকেন সুদীপ, ধরে নিলাম পাত্রীর অজ্ঞাতসারেই তার পূর্বপ্রণয়ী চিঠিটা লিখে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে। কিন্তু পাত্রীর একজন প্রণয়ী ছিল বা আছে, এটা কি তার পক্ষে একটা গৌরবের ব্যাপার? এ কথা জানার পরে আমাদের সমাজে কি এমন একটি পাত্রীর বর জুটবে?

—না জামাইবাবু, তা' জুটবে না। তবে এমনও তো হতে পারে আমরা যা আশঙ্কা করছি সেসব কিছুই নয়। ওদের পরিবারের কোন শত্রু একাজ করে ওদের বিপাকে ফেলতে চাইছে।

পাত্রীর পক্ষে পাত্রর এধরনের ওকালতি ভয়ানক বিসদৃশ ঠেকে সুদীপের চোখে। এ আবার কোন্ ধরনের আধুনিকতা? ভাব-ভালোবাসার বিয়েতে হয়তো এসব চলতে পারে। কিন্তু দেখে-শুনে পাত্রী নির্বাচন করা বিয়েতে পাত্রীর পক্ষে পাত্রর এমনি জোর সওয়াল বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সুদীপ নিজের মনের ভাব চেপে বললেন, হতে তো অনেক কিছুই পারে। তবে, এসব রিস্কের মধ্যে আমাদের যাবার দরকার কি? দেশে কি মেয়ের অভাব?

মৃদু হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছেন জামাইবাবু। ঐ একটা বিষয়ে এদেশে অভাব-অনটনের লেশমাত্রও নেই। ডিম্যাণ্ডের চাইতে সাপ্লাই অনেক বেশি। তাই দর-দামও চড়চড় করে পড়ে যাচ্ছে। কথা তা' নয়। আমি বলছি কি, ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে। তাই বিয়ের প্রস্তুতিও নিশ্চয়ই চলছে। এই সময় হঠাৎ বিয়ে ভেঙে দিলে—।

—ওদের অসুবিধে হবে, এই তো? সব্যসাচীর অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করে দিয়ে বলতে থাকেন সুদীপ, কিন্তু অন্যের সুবিধে দেখতে গিয়ে নিজের অসুবিধের কথা ভুলে যাওয়া মহৎ কাজ হলেও বুদ্ধিমানের কাজ নয় মোটেই।

সব্যসাচী আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। সুদীপ শ্যালকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন, যে কোন কারণেই হোক্ এই বিয়ে ভেঙে দিতে সব্যসাচীর তেমন একটা ইচ্ছে নেই। কিন্তু কেন? তবে কি এটাও কোন ভাব-ভালোবাসার ব্যাপার? কিন্তু তা-ই বা হবে কেমন করে? তিনি নিজেই তো খবরের কাগজ দেখে এই যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। তা'হলে সব্যসাচী হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে পাত্রীকে দেখে এসেছে, আর তাতেই তার মাথা ঘুরে গেছে। একেই হয়তো বলে—লাভ এ্যাট্ দি ফার্স্ট সাইট। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম।

আর তাতেই বোধহয় সব্যসাচী এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্য নয়। মেয়েটা বাস্তবিকই অপরূপা।

খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে সুদীপ বললেন, দেখ অসভ্য, বিষয়টা বড়ই জটিল। চট্ করে একটা কিছু ডিসিসন না নেওয়াই ভালো। তা'ছাড়া, আমরা বিয়ে ভেঙে দিয়ে বদনাম কুড়োতে যাই কেন? তার চাইতে পাত্রীর দাদা বৌদির কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। ও'রা ব্যাপারটা দেখুন, জানুন। চিঠি পেয়ে ওদের রি-এ্যাক্‌শন কেমন হয় আগে দেখি। তারপর না হয় একটা ডিসিসন নেওয়া যাবে, কি বলো?

সব্যসাচী এতক্ষণ তার এই ভগ্নিপতিটির সঙ্গে যুক্তির উতোর—চাপানে এতই ব্যস্ত হয়ে ছিল যে অন্য কোন দিকে খেয়াল ছিল না তার। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হয়ে গেছে। তাই সে সুদীপের কথার জবাবে কেবল বললে, আপনারা সবাই রয়েছেন, যা ভালো বোঝেন করুন। আমি আর কি বলবো?

সুদীপ কেবল মনে মনে বললেন, বলার আর কিই বা বাকি রাখলে, ভাই?

(আট)

ছোটসাহেব সজল মিত্রর খাস বেয়ারা পরমেশের দাপট এই অফিসে একটু বেশিই বলতে হবে। সোজা কথা তো নয়, খোদ্ ছোট সাহেবের বেয়ারা। তাই অফিসের বাবুদের মধ্যে অনেকেই একটু খোসামোদ করে চলে তাকে। ছোট সাহেবের কাছে কোন আর্জি পেশ করার আগে কেউ কেউ এই পরমেশের মারফতই সাহেবের মুড সম্পর্কে খবরাখবর নেয়। পরমেশ হয়তো গম্ভীর কণ্ঠে বলে, না—না ব্যানার্জীবাবু, এখন সাহেবের কাছে যাবেন না। আজ সকাল থেকেই সাহেব ফায়ার।

—কেন, কি হলো?

—আর বলেন কেন। একটা জরুরী ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চক্রবর্তীবাবুর ওপর তো সাহেব মহা খাপ্পা। বাবুকে ঘরে ডেকে এনে খুব একচোট ধমকালেন।

—শেষে পাওয়া গেল ফাইল?

—পাওয়া যাবে না মানে? পান খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হেসে পরমেশ বলতে থাকে, এই পরমেশ নায়েক হাজির থাকতে ফাইল যাবে কোথায়? আমিই শেষে সেই ফাইল খুঁজে বের করে দিলাম। সাহেব তো মহাখুশি। বললেন, পরমেশ, তুই কেন যে একটু লেখাপড়া শিখলি না। লেখাপড়া জানলে তোকে তো টেবিল চেয়ারে বসিয়ে দিতাম।

ব্যানার্জীবাবু হয়তো বলে, তা'হলে এখন তো সাহেবের মেজাজ শান্তই আছে। তবে কেন তাঁর কাছে যেতে বারণ করছো?

—না বাবু, আমার ওপর খুশি বলে কি মেজাজ শান্ত বলে মনে করেছেন? মোটেই তা' নয়। এই তো একটু আগে খোদ্ বড়বাবুকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। তাই বলছিলাম এখন সাহেবের কাছে যাবেন না।

—কিন্তু আমার যে বড় দরকার, পরমেশ। কিছু এ্যাড্ভান্স না পেলে আমার যে কিছুতেই চলবে না।

একটু সময় চিন্তা করে পরমেশ হয়তো বলে, ঠিক আছে ব্যানার্জীবাবু, আপনি আপনার সীটে চলে যান। সাহেবের মুড্ একটু ভালো হলেই আপনাকে খবর দেব।

মিথ্যে বলে নি পরমেশ। ঘন্টাখানেক পরেই সে নিজে গিয়ে সেই ব্যানার্জী-বাবুকে ডেকে এনে সাহেবের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর সেই সুবাদে বিকেলে ব্যানার্জীবাবুর কাছ থেকে বিস্কুট সমেত এক কাপ চা ও একটা সিগারেট আদায় করেছিল।

অফিসের বড়বাবু অর্থাৎ হেড্-ক্লার্ক ছাড়া পরমেশ অফিসের কাউকে কখনও নমস্কার করতো না। অফিসের অন্য বেয়ারারা যেখানে বিনীত ভঙ্গিতে অন্যের খিদ্‌মদ্‌গারিতে সততই ব্যস্ত থাকতো, সেখানে পরমেশ চলাফেরা করতো গট্‌মট করে বুক ফুলিয়ে। প্রতিমুহূর্তেই সে মনে করতো যে সে হচ্ছে ছোটসাহেবের খাস বেয়ারা—বেয়ারা কুলের কুলীন।

সেই পরমেশই সেদিন কি একটা কাজে সবিতার ঘরে ঢুকে সবিতাকে একটা নমস্কার করে বসলো।

বিস্মিত চোখে সবিতা পরমেশের দিকে তাকাতেই পরমেশ বিগলিত ভঙ্গিতে বললে, আর ক'টা দিন বা আপনি এ অফিসে আছেন দিদিমণি।

—তার মানে? ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সবিতা তার সুন্দর ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে বলতে থাকে, আমাকে কি বরখাস্ত করা হবে নাকি?

—কি যে বলেন, দিদিমণি। আপনাকে বরখাস্ত করবে কে?

—তবে যে বললে, আমি আর এ অফিসে বেশিদিন নেই?

—বারে, হেসে জবাব দেয় পরমেশ, বিয়ের পরে আপনি আর এখানে চাকরি করবেন নাকি?

. পরমেশের কথায় সবিতা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার। এরা তার বিয়ের কথা জানতে পারলো কেমন করে?

জিজ্ঞেস করে সবিতা, আমার বিয়ের খবর তুমি জানলে কেমন করে?

তেমনি হেসে পরমেশ জবাব দেয়, আমি কেন, অফিসের সবাই তো এ খবর জানে। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে।

—তাই নাকি? এত খবর জানতে পেরেছ তোমরা?

একটা সবজান্তার হাসি হেসে বলতে থাকে পরমেশ, এ সব খবর কি বেশিদিন চাপা থাকে, দিদিমণি? আমরা সব জানি। আপনার শ্বশুর যে পি. জি. হাসপাতালের বড় ডাক্তার তাও আমরা জেনে গেছি।

বিস্ময়ে প্রায় বোবা বনে যায় সবিতা। এত খবর এরা পেল কোত্থেকে? এরা যে পুলিসের গোয়েন্দাকেও হার মানিয়েছে। পি, জি, হাসপাতালের বড় ডাক্তারের বিলেত ফেরত ছেলের সঙ্গে যে তার বিয়ে হতে চলেছে সে খবরও যে এরা জেনে বসে আছে। এর পরে হয়তো এই পরমেশই বলে দেবে, এই বিয়েতে তার জন্যে ক'খানা শাড়ি কেনা হয়েছে, কোন্ দোকান থেকে তৈরি হয়েছে গয়না, দই-মিষ্টি আসবে কোন্ দোকান থেকে ইত্যাদি যাবতীয় খবর যা নাকি সবিতা নিজেও ভালোমত জানে না।

যাক্‌গে—মনে মনে ভাবতে থাকে সবিতা, আজ হোক, কাল হোক, এরা তো জানতে পারবেই। তাই খবরের উৎস সম্পর্কে পরমেশকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে মৃদু হেসে সে কেবল বললে, সব খবরই যে ঠিক ঠিক পেয়ে গেছ দেখছি।

—হ্যাঁ দিদিমণি, হেসে জবাব দেয় পরমেশ, লুচি-মেঠাই থেকে যেন বাদ পড়ি না। সেবার অমিতা দিদিমণি আমাদের খুব ঠকিয়েছিলেন।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সবিতা বললে, না পরমেশ, অফিসের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবচাইতে প্রথম নিমন্ত্রণ হবে তোমার।

সবিতার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার পর থেকে নিভাননীর পুজো-অর্চনার রুটিনে কিছু রদবদল ঘটেছিল। সবিতা অফিস থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি ঠাকুরঘরে যেতেন না। সবিতা বাড়ি এসে চায়ের টেবিলে বসলে তিনি এসে মেয়ের কাছে বসতেন। এটা ওটা কথা বলতেন তার সঙ্গে। বাসন্তী কাছে থাকলে বিয়ের ব্যাপার নিয়েও কথা বলতেন দু'চারটা। তারপর সবিতা নিজের ঘরে চলে গেলে তিনিও উঠে যেতেন ঠাকুর ঘরের দিকে। মেয়ের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনাই বোধ হয় নিভাননীর এই রুটিন পরিবর্তনের কারণ।

সেদিন কিন্তু নিভাননীর এই নতুন রুটিনেও আবার পরিবর্তন ঘটলো। সবিতার চায়ের টেবিলে এলেন না তিনি। তার বদলে বাসন্তী গম্ভীর মুখে তার পাশে এসে বসতেই সবিতা জিজ্ঞেস করে, মাকে দেখছিনা যে?

—তিনি ঠাকুর ঘরে। জবাব দেন বাসন্তী।

ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে বলে বাসন্তীর গাম্ভীর্যই এখন সবিতার কাছে স্বাভাবিক। বরঞ্চ কোনদিন কোন কারণে বাসন্তীর সেই গাম্ভীর্যে সামান্য ঘাটতি হলেই ব্যাপারটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে সবিতা একটু ভালোমত নজর করলে অনায়াসেই বুঝতে পারতো বাসন্তী যেন একটু বেশি পরিমাণে গম্ভীর।

বাসন্তীকে মুখোমুখি স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে সবিতা তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কিছু বলবে, বৌদি ?

এতক্ষণে একটু নড়েচড়ে বসেন বাসন্তী। ননদের মুখের ওপর একবার আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এমনিভাবে আমাদের সবাইকে অপমান না করলে কি চলতো না ?

চায়ের কাপটা নিঃশেষ হতে তখনও কিছু বাকি ছিল। বাসন্তীর কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে কাপটা ঠেলে সরিয়ে রেখে সবিতা বলে ওঠে, কার কথা বলছো বৌদি ?

এতক্ষণ বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে ছিল শুধুই গাম্ভীর্য। এবার তার সঙ্গে খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে তিনি বললেন, কার কথা বুঝতে পারছো না ?

সবিতা কিন্তু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। তাই সে বিস্মিত দৃষ্টিতে বাসন্তীর দিকে তাকাতেই বাসন্তী তাঁর হাতের মুঠো থেকে ভাঁজ করা সেই ইনল্যাণ্ড চিঠিটা বের করে সবিতার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, কষ্ট করে এটা একবার পড়ে দেখ। তাহলেই বুঝতে পারবে।

সবিতার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। কি ব্যাপার ? সবাইকে সে কেমন করে অপমান করলে ? গুরুজনদের অপমান করার কথা তো সে কল্পনাই করতে পারে না। তবে কেন এই অনুযোগ ?

সবিতা আর কিছু না বলে নিঃশব্দে চিঠিখানা তুলে নেয় নিজের হাতে। স্পষ্ট চিঠি। সুন্দর হস্তাক্ষর। চিঠিটা পড়তে পড়তে কিন্তু কুঁচকে ওঠে তার সুন্দর ভ্রূযুগল। অফিসে সারাদিন খাটুনির পরে ক্লান্ত মন যখন একটু নিরুদ্বেগ বিশ্রাম চাইছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে চিঠির কালো অক্ষরগুলো যেন তীরের মত ছুটে আসছিল তার দিকে। এগুলো যেন কালির অক্ষর নয়, এর প্রত্যেকটিই যেন ভয়ঙ্কর বিষ-মাখানো তীর যার আঘাত একটি নিরপরাধ কুমারী মনকে মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে অনায়াসে।

মিথ্যার বিষ-বাষ্পে মোড়া এই ভয়ঙ্কর চিঠিখানা কে লিখলো পাত্রের বাবাকে ? কি তার পরিচয় ? কি তার উদ্দেশ্য ? উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট—বিয়ে ভেঙে দেওয়া। কিন্তু কেন ? সবিতা কি অপরাধ করেছে তার কাছে ? শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দটির

আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সেই লেখক। কিন্তু কেন? ভীরু, কাপুরুষেরাই এমনি ভাবে লুকিয়ে থাকে। সভ্যতা, শালীনতাহীন জংলি মনোবৃত্তির কারুর পক্ষেই কেবল এমনি বিষ মাখানো তীর ছোঁড়া সম্ভব।

সেই মুহূর্তে এই বিরাট মিথ্যের কলঙ্কের বোঝা সবিতাকে যতটা না কষ্ট দিচ্ছিল তার চাইতে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তার বৌদির কথাগুলো। সে যেন ষড়যন্ত্র করে বাড়ির সবাইকে এই বিয়ের দোরগোড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে শেষে এমনি একটা কান্ড করে বসে তাদের অপমান করেছে। এর চাইতে বড় মিথ্যা যে আর কিছু হতে পারে না এটা যে তার বৌদি পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না সেটাই সবিতার বড় দুঃখ। তার মাও বোধহয় সেই কথাই বিশ্বাস করে নিজেকে ঠাকুরঘরে আটকে রেখেছেন। মেয়ের মুখ দেখতে বোধহয় চান না তিনি।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখ ফেটে জল আসছিল সবিতার। যিনি তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন সেই বৌদি যখন তাকে চিনতে না পেরে এধরনের কথা বলছেন তখন ভবানীপুরের সেই বাড়ির লোকেরা যে এগুলো ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এর চাইতে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? সেই মুহূর্তে লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার।

সবিতাকে মাথা নীচু করে চুপ্ করে থাকতে দেখে বাসন্তী আবার বললেন, তোমার যদি বিশেষ কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল তাহলে সেকথা আমাদের আগে জানালেই তো পারতে। এমনিভাবে আমাদের উঁচু মাথা নীচু করে দিয়ে কি লাভ হলো তোমার?

যে ভয়ানক দুঃখে সবিতা এতক্ষণ ম্রিয়মান হয়ে ছিল তার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল বাসন্তীর কথায়।

প্রতিকারহীন দুঃখ সেই মুহূর্তে পর্যবসিত হলো রাগে। দমবন্ধকরা প্রচণ্ড ক্রোধে তার চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেতেই এতটা বয়স পর্যন্ত সে যা কখনও করেনি তাই করে বসলো। বাসন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে, কি বলতে চাও তোমরা? নিজের পছন্দমত বিয়ে করার জন্যে আমি নিজেই নিজের চরিত্রে কলঙ্ক ছড়িয়ে এই চিঠি লিখিয়েছি, কেমন?

সবিতার ভাব-ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে প্রথমটায় একটু যেন ঘাবড়ে যান বাসন্তী সবিতার এই রূপ তাঁর কাছে একেবারেই নতুন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তা' হয়তো নয়। তবে এমনও তো হতে পারে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে বলেই সে এমনিভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে?

সহসা সমস্ত প্রতিরোধ তুলে নেয় সবিতা। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে জলের ধারা। কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে থাকে, না—না

বৌদি, তোমরা আজও আমাকে চিনতে পারোনি। তেমন কেউ আমার কখনও ছিল না, এখনও নেই। শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই আমাকে এত ছোট ভাবতে পারলে ?

বলতে বলতে কান্নার আবেগে তার সারা দেহটা কাঁপতে থাকে থর থর করে। পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর চোখে আঁচল চেপে ছুটে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে।

বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সবিতা। মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গ খাড়া করতে চেষ্টা করে সে বিফল হয়েছে। আর সেই বিফলতা নোনা জলের রূপ ধরে তার পটলচেরা চোখের কোল বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল তার মাথার বালিশ।

হঠাৎ সবিতার মনে হলো কে যেন তার শিয়রের কাছে বসে কোলের ওপর তার মাথাটা তুলে নিয়ে তার কৃষ্ণঘন চুলের মধ্যে আলতো ভাবে হাত বুলোচ্ছে। কে ? মা নাকি ?

চোখ মেলে তাকায় সবিতা। না, মা নয়, বৌদি। কিন্তু এ কোন্ বৌদি ? এ যে তার একান্ত অপরিচিতা! চিরকালের গম্ভীর একটু কড়া প্রকৃতির বৌদির চোখের কোণে কি ঐ চকচক করছে ? জল ? আশ্চর্য ব্যাপার। এতটা বয়স পর্যন্ত যাঁর চোখে সবিতা কোনদিন একফোঁটা জলবিন্দু দেখেনি তিনি কাঁদছেন ? এ যে বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

সবিতার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাসন্তী যে সুরে কথা বললেন তাও সবিতার একান্ত অপরিচিত। মৃদু কোমল কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, সবু। বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা। এইসময় হঠাৎ এই চিঠিটা পেয়ে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে কি সব কথা তোমাকে বলেছি। যা বলেছি তা' যে একান্তই মিথ্যে তা' তো আমার চাইতে বেশি কেউ জানে না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, সবু।

বাসন্তীর দুর্বল অসহায় কণ্ঠস্বরে বুকের ভেতর যেন কেমন করে ওঠে সবিতার। চোখের জল মুছে উঠে বসে সে। বাসন্তীর কান্না ঝরা মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। তারপর সহসা তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলতে থাকে, না—না বৌদি, এমনি ভাবে আর কথা বলো না তুমি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

রাতে পাশাপাশি খেতে বসেছে ভাই-বোন। পরিবেশন করছিলেন বাসন্তী। পাশে আর একটা চেয়ারে বসে ছেলে-মেয়ের খাওয়া দেখছিলেন নিভাননী।

খেতে খেতে পবিত্র একসময় বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেন, সেই চিঠির কথা মাকে বলেছ ?

স্বামীর দিকে ঝোলের বাটি এগিয়ে দিতে দিতে বাসন্তী জবাব দেন, হ্যাঁ

বলেছি। চিঠিটা পড়েও শুনিয়েছি। এসব বাজে উড়ো চিঠি নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। তাছাড়া, যাঁদের কাছে চিঠিটা এসেছে তাঁরাও এর কোন গুরুত্ব দেন নি।

নিভাননী এই সময় পুত্রবধূকে সমর্থন করে বললেন, ঠিকই বলেছে বৌমা। বেচারার পরিশ্রমই সার।

—কার কথা বলছো মা? জিজ্ঞেস করেন পবিত্র।

জবাব দেন নিভাননী, বলছি সেই বেচারার কথা যে নাকি কষ্ট করে চিঠিটা লিখে বিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। জানিনা সে কে। তবে তার সব চেষ্টাই বিফলে গেছে। ভবানীপুরের ওরা এই চিঠিটাকে তেমন একটা আমলই দেন নি, তাই না বৌমা?

—হ্যাঁ মা, শাশুড়িকে সমর্থন করে বলতে থাকেন বাসন্তী, বাস্তবিকই ভদ্রলোক ও'রা। বিয়ে ভাঙার কথা ও'রা উচ্চারণও করেন নি। ভবিষ্যতে আরও কোন বিপদ ঘটতে পারে সে কথা মনে করেই চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়ে আমাদের একটু সাবধান করে দিয়েছেন মাত্র।

নিভাননী বললেন, যা বলেছ বৌমা। সবুর বরাত ভালো যে এই পরিবারে ওর বিয়ে হতে চলেছে।

পবিত্র আর কিছু না বলে খেতে খেতে কেবল ভাবতে থাকে স্ত্রী বাসন্তীর কথা। সত্যিই ওর ক্ষমতা আছে। বিয়ের মাত্র কয়েকটা দিন আগে পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে এ ধরনের একটা চিঠি পেলে পাত্রীপক্ষের যে কোন লোকেরই মাথা খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে তার মা নিভাননীর মত মৃদু চরিত্রের মহিলার পক্ষে তো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক। সেখানে কোন্ মন্ত্রবলে যে বাসন্তী তাঁকে এতটা শক্ত ও নিশ্চিন্ত করে তুললো তা' সে-ই জানে।

মাথা নীচু করে খেতে খেতে সবিতাও তার বৌদি বাসন্তীর কথাই ভাবছিল। বৌদি ও তার নিজের মধ্যে সন্ধ্যায় যে নাটকটুকু অভিনীত হয়েছিল তা তিনি সবিতার দাদা ও মার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করে রেখেছেন। নিজের মনে প্রচণ্ড ঝড় নিয়েও সেই ঝড়ের এতটুকু আঁচ তিনি নিভাননীর মনে লাগতে দেননি। গোটা ব্যাপারটাকেই তিনি এমন হালকা প্রতিপন্ন করেছেন যেন এটা কোন একটা ব্যাপারই নয়। নিজের অশান্ত মন নিয়ে অন্যকে শান্ত রাখার এই আশ্চর্য গুণের সন্ধান পেয়ে বাসন্তীর জন্যে গর্বে আনন্দে মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে সবিতার।

সারা রাত বিছানায় শুয়ে কেবল ছটফট করে সবিতা। কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই সেই চিঠিটার কালো অক্ষরগুলো যেন ভূতের মত চেহারা নিয়ে তার চোখের সামনে এসে নাচতে থাকে। কে লিখেছে এই চিঠি? কে হতে পারে? কি লাভ তার? কেবলমাত্র এই বিয়ে ভেঙে দেওয়াই কি তার

উদ্দেশ্য, নাকি এর পরেও কিছু আছে? যদি থাকে তো তা' কি হতে পারে?

পাত্রপক্ষ সত্যিই মহৎ। এরকম অবস্থায় তাঁদের পক্ষে এই বিয়ে ভেঙে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁরা তা' করেন নি। ঐ চিঠির ওপর কোন গুরুত্ব দেন নি বলেই তা' করেন নি। কিন্তু তাঁদের মনে কি সামান্যতম সন্দেহও জাগে নি? পাত্রীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এমন নির্বিকার কি কেউ হতে পারে?

পাত্রের মা-বাবা মহৎ হতে পারেন কিন্তু সেই মহত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করার মতো মনের জোর সবিতার কোথায়? প্রশ্ন জাগে মনে, সত্যিই কি এই মহত্ব নির্ভেজাল? এর মধ্যে কি দয়া কিম্বা অনুকম্পা একেবারেই অনুপস্থিত?

কথাটা মনে হতেই মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সবিতার। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মনটা। তার কেবলই মনে হতে থাকে, এর মধ্যে অবশ্যই দয়া কিম্বা অনুকম্পা জড়িয়ে রয়েছে। একটি কুমারী মেয়ের প্রতি দয়া কিম্বা অনুকম্পাই তাঁদের এই বিয়ে ভেঙে দেওয়া থেকে বিরত করেছে। সম্ভবতঃ তার এই সুশ্রী চেহারাটাই সেই অনুকম্পার কারণ, নইলে স্বাভাবিক পরিণতিই ঘটতো এই বিয়ের—ভেঙে যেত। এদেশে এধরনের পরিণতির উদাহরণের মোটেই অভাব নেই। এর চাইতে ঢের ঢের হাল্কা কারণে এদেশে বিয়ে ভেঙে যায়।

কলঙ্ক রটনাকারীকে চিনতে পারলে নিজের বিদ্রোহী মনটাকে বশে আনা সবিতার পক্ষে হয়তো সহজ হতো। সেক্ষেত্রে সেই রটনাকারীর মুখোশ খুলে দিয়ে সে হয়তো প্রমাণ করতে পারতো যে সেটা কেবলমাত্র রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই অবস্থায় পাত্রপক্ষের কাছ থেকে দয়া কিম্বা অনুকম্পা লাভের কোন প্রশ্নই উঠ্তো না। সেই রটনাকারী পর্দার আড়ালে আছে বলেই তো একমাত্র পাত্রপক্ষের বিশ্বাসের ওপর সবিতাকে নির্ভর করতে হবে। প্রমাণহীন এমনি বিশ্বাস তো কেবল অনুকম্পারই নামান্তর।

বিদ্রোহী মনটাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারে না সবিতা। যতই ভাবতে থাকে ততই তার মনটা সেই অদৃশ্য পত্রলেখকের ওপর এক প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। হাতের কাছে পেলে সেই লোকটাকে দু'ঘা বসিয়ে দিতেও বোধহয় সবিতা পিছিয়ে যেত না। সেই মুহূর্তে সবকিছুই যেন কেমন খারাপ লাগে তার। সবকিছুর ওপরেই যেন কেমন এক অবিশ্বাস। পাত্র-পক্ষের উদারতায়ও সন্দেহ। জ্বরের মুখে মিষ্টিও হয়ে ওঠে তেতো।

পরের দিন শরীর খারাপের অজুহাতে অফিসে গেল না সবিতা। সারাটা দিন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলো। পত্রলেখককে খুঁজে বের করতে গিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে লাগলো পাত্রপক্ষের উদারতা। অবশেষে নিজের মনে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছে

সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতেই তার মা ও দাদা-বৌদি ভয়ানক চমকে উঠলেন।

দৃঢ় কণ্ঠে সবিতা তাঁদের বললে, ও'রা না ভাঙলেও এই বিয়ে তোমরা ভেঙে দাও।

পবিত্র ও বাসন্তী সবিতার কথায় চুপ্ করে রইলেন। নিভাননী মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বলছিস তুই, সবু ?

—হ্যাঁ মা, ঠিকই বলছি। এ বিয়ে হতে পারে না।

—ওঁদের এত আগ্রহ সত্ত্বেও এই বিয়ে ভেঙে দিতে হবে ? গম্ভীর সুরে বললেন বাসন্তী।

—হ্যাঁ বৌদি, জবাব দেয় সবিতা। ওঁদের দয়ার দান আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না।

— দয়ার দান ? কি বলছো তুমি ?

—হ্যাঁ বৌদি, তোমরা যাকে ভাবছো উদারতা, আমি তাকে বলছি অনুকম্পা। এমন একটা বিশ্রী চিঠি পাওয়ার পরেও যাঁরা বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছেন না কিম্বা পাত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠছেন না, তাঁদের এই মনোভাবকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

—তাঁরা যদি সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়ে ভেঙে দিতেন তা'হলেই বুঝি তোমার মতে সেটা ভালো হতো ?

—না বৌদি, ভালো খারাপের কথা আমি বলছি না। তবে সেটাই স্বাভাবিক হতো। এই অস্বাভাবিক আচরণের পেছনে তাঁদের যে মনোভাব কাজ করছে তার নাম দয়া—অনুকম্পা। দয়ার দান গ্রহণ করে কারুর বাড়ির বধূ হতে আমি চাই না, বৌদি। তোমরা আমাকে এ বিষয়ে আর কোন অনুরোধ করো না।

চিরকালের লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির সবিতার মুখে এমন অশান্ত কথার দাপটে উপস্থিত তিনজন ব্যক্তিই চুপ্ করে থাকেন। সবিতার কথার ধরনে এটা তাঁদের কাছে সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এ থেকে ঐ মেয়েটিকে বিচ্যুত করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। নিজের বলার কথা শেষ করে সবিতা মাথা নীচু করে থাকে, আর বাকি তিনজনও বসে থাকেন নিঃশব্দে। কেবল বৃদ্ধা নিভাননীর সারা মুখে ফুটে ওঠে বেদনার চিহ্ন, আর গম্ভীর বাসন্তীর মুখখানা হয়ে ওঠে আরও গম্ভীর।

পবিত্র কথা বলেন কম, বোধহয় আদালতে বেশি বলতে হয় বলেই বাড়িতে কম কথা বলে ব্যালান্স রাখেন। নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই এবার বোনকে জিজ্ঞেস করেন, বেশ তো, বুঝলাম তোমার কথা। এই বিয়ে না হয় ভেঙেই দিচ্ছি।

কিন্তু তারপরে ? তোমার বিয়ের জন্যে আর কোন চেষ্টা করার দরকার নেই—এটাই কি তুমি বলতে চাইছো ?

একটু সময় তেমনি মাথা নীচু করেই থাকে সবিতা। তারপর ধীরে মাথা তুলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, আপাততঃ দরকার নেই, দাদা। আগে আমি চিঠির এই লেখককে খুঁজে বের করতে চাই। যে করেই হোক, একে আমি খুঁজে বের করবোই। তারপরে তোমরা আমার বিয়ের কথা চিন্তা করো।

—বেশ, ধরে নিলাম আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ কিম্বা তোমার অফিসের কেউ যে কোন কারণেই হোক এই চিঠি লিখে আমাদের অপদস্থ করে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে। তর্কের খাতিরে ধরেও নিলাম সুচতুর গোয়েন্দার মত তুমি তাকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হলে। কিন্তু তারপর ?

জবাব দেয় সবিতা, তারপরের কথা না হয় তারপরে চিন্তা করা যাবে, দাদা।

এই সময় নিভাননী আক্ষেপের সুরে বলে ওঠেন, এমন একটি সুপাত্র কি আর যখন-তখন হাতের কাছে পাওয়া যাবে ? তা'ছাড়া, বিয়ের আয়োজন সব ঠিক। আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যেও অনেকে এই খবর জেনে গেছে। এখন বিয়ে ভেঙে গেলে যে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না।

—ওঁরা যদি বিয়ে ভেঙে দিতেন তা'হলেও তো তোমাদের সেই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হতো, মা।

—তা' ঠিক, নিভাননীর বদলে এবার মৃদু গম্ভীর সুরে বলে ওঠেন বাসন্তী, তবে দু'টো পরিস্থিতি এক নয়, সবু। ওঁরা ভেঙে দিলে সবাই জানতে পারবে যে একটা উড়ো চিঠির ওপর নির্ভর করে ওঁরা বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। আর আমরা ভেঙে দিলে আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে প্রচার হবে যে ঐ চিঠির বিষয়-বস্তুকে মেনে নিয়ে আমরাই এটা ভেঙে দিয়েছি। আজ হোক, কাল হোক এই উড়ো চিঠির খবর—সবাই জানতে পারবে।

সবিতা আর কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাড়ায়। তারপর সমস্ত আলোচনার ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে বললে, এ বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই, বৌদি। কথাটা শেষ করে সবিতা সেখান থেকে উঠে যায়।

(নয়)

পুরুষের জীবনে বিয়ে যদি হয় একটা ঘটনা, তা'হলে মেয়েদের জীবনে সেটা একটা কাহিনী। বিয়ের তাৎপর্য পুরুষের জীবনে যদি হয় একটি অগভীর পুকুর তা'হলে মেয়েদের বেলায় সেটা এক গভীর সমুদ্র। তাই প্রস্তুতির পরে বিয়ে ভেঙে গেলে পুরুষের বেলায় যেখানে পুকুরের জলে দেখা দেয় সামান্য আলোড়ন, মেয়েদের বেলায় সেটাই হয়ে ওঠে এক ভয়ানক সামুদ্রিক ঝড়। ঝড় থামলেই শান্ত হয় পুকুর, কিন্তু সমুদ্রের জলের সেই উথালি-পাথালি ঢেউ যেন থেমেও থামতে চায় না।

বিয়ে ভেঙে গেছে। খবরটা অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নির্দ্বিধায় বলেও দেয় সব্যসাচী। বন্ধুরা সামান্য কৌতূহল দেখিয়েই চুপ করে। কিন্তু আলোচনা করার মত এটা কোন ব্যাপারই নয় তাদের কাছে। এক জায়গায় ভেঙেছে তো আর এক জায়গায় হবে। খবরটা শুনে অফিসের কুমারী মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো একটু নড়েচড়ে বসে। অতীতের মিস্ ও বর্তমানের মিসেস বন্দনা আচার্য হয়তো আর একবার সব্যসাচীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়। ব্যাস, আলোড়ন এই পর্যন্ত। ব্যাপ্তি এর চাইতে বেশি নয় মোটেই।

সবিতা কিন্তু রেহাই পায় না এত তাড়াতাড়ি। বাসন্তীর তাগিদে বিয়ের জন্যে পুরো এক মাসের ছুটি চেয়েছিল সে। কিন্তু সেই ছুটি মঞ্জুর হবার আগেই সে অফিসের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয় যে কোন এক বিশেষ কারণে তার আর ছুটির প্রয়োজন নেই। খবরটা অফিসে ছড়িয়ে পড়তেই কৌতূহলীরা উঠেপড়ে লাগে আসল খবর জানবার জন্যে। শুরু হয় নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। সবিতা কিন্তু থাকে মুখে কুলুপ এঁটে। নিজের মুখে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা সে কাউকে বলতে পারে না। কাজেই দেখতে দেখতে গজিয়ে ওঠে জল্পনা-কল্পনার ডানা। সেই ডানায় ভর করে জল্পনা-কল্পনা যদৃচ্ছভাবে এদিক-ওদিক উড়তে থাকে। অফিসের অন্য মেয়েরা নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসে। স্টোর কীপার অমল বাগচীর হয়তো হঠাৎ মনে পড়ে যে অনেকদিন সবিতার কুশল খবর নেয়া হয় নি। নাট্যকার দিব্যেন্দু সান্যাল সম্ভবতঃ নিজের ইউনিটকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা ফাঁদে। অ্যাকাউন্ট্স ডিপার্টমেন্টের অরুণ রায় বোধহয়

অফিসের বেসিনে ঘন ঘন মুখ ধোয়ার অছিলায় দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের চেহারাটিকে বারে বারে দেখে নেয়। আর, উঠতি কবি রথীন চ্যাটার্জী হয়তো আপন মনের গহন কন্দরে নতুন কোন কবিতা সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করে। এ যেন শীতের শেষে বসন্তর আগমনের মত একটা ঘটনা। শীতে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাসনা-কামনার সাপ যেন গ্রীষ্মের আগমনে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে নতুন করে প্রস্তুত হয়।

বাইরের আচার আচরণে সবিতার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল সে এ জ্বালা অপমানের জ্বালা। যে লোক সেই চিঠিখানি লিখে তাকে ও তার পরিবারকে অপমান করেছে সেই লোককে খুঁজে-পেতে বের করার চিন্তাতেই রাত-দিনের অধিকাংশ সময় সে ব্যয় করে। কিন্তু চিন্তাই সার। কোন পথই সে দেখতে পায় না।

মাঝে মাঝে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধে মেতে ওঠে সবিতা। আচ্ছা, এ কাজ তার কাতুপিসি করেন নি তো? ঐ মহিলার অসাধ্য তো কিছু নেই। নিজের প্রয়োজনে উনি সব কিছুই করতে পারেন। গুণধর দেওর-পো মন্টা গুহর গলায় মালা পরাতে সবিতার হাত যখন সত্যিই উঠলো না তখন তার পক্ষে এই পথ বেছে নেওয়া কি একান্তই অসম্ভব? হয়তো মন্টা গুহ নিজেই এই চিঠি লিখেছে। আর, বিয়ে ভাঙার খবর পেয়ে মনে মনে হাসছে।

পরক্ষণেই কিন্তু আবার কাতুপিসির স্বপক্ষে যুক্তির জাল বিছিয়ে চলে সবিতা। না—না. কাতুপিসি এমন নীচু কাজ করতে পারেন না। শত হলেও তিনি সবিতার পিসি। তার বাবার বোন। নিজের ভাইঝিকে কি কেউ এমন অপমান করতে পারে?

কাতুপিসি নাকচ হয়ে যেতেই অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাবতে থাকে সবিতা। তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে কি? বোধহয় না। তাদের মধ্যে এমন নীচ চরিত্রের কেউ আছে বলে মনে হয় না তার।

তা'হলে কে— কে এ কাজ করতে পারে? তার অফিসের কেউ নাকি? অমল, দিব্যেন্দু, অরুণ, রথীন—এদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়। তার নিজের ওপরে এই চারজনের দুর্বলতার খবর সবিতার অজানা নয়। বিয়ের খবর পেয়ে এদের মধ্যেই কেউ হয়তো মরীয়া হয়ে উঠে এমনি কাজ করেছে। কে হতে পারে? অমল? কিন্তু সে তো বিবাহিত। তা'ছাড়া সে কোনদিন নিজের মুখে সবিতার ওপর তার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে নি। ভদ্রলোকের হয়তো তার সান্নিধ্য ভালো লাগে। তাই প্রতিদিন অন্ততঃ একটিবার এসে তার খবরাখবর নিয়ে যায়।

বেশ তো, অমল না হোক দিব্যেন্দু তো হতে পারে। এই লোকটি যে

অনেকবার অনেকভাবে তার কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করেছে এবং সবিতা যে তাকে বারে বারেই দূরে ঠেলে দিয়েছে তা' তো মেটেই মিথ্যে নয়। পুরুষের বিশেষ করে নাট্যকার দিব্যেন্দুর পক্ষে এটা তো রীতিমত এক অপমান। সেই অপমানের শোধ হয়তো সে এমনিভাবেই নিয়েছে। তবে দিব্যেন্দুর সাধারণ আচার-আচরণ তো বেশ ভদ্র। এমন একটি ভদ্র যুবক কি এমন একটা বিশ্রী কাজ করতে পারে?

ধরে নেওয়া গেল, দিব্যেন্দুও একাজ করে নি। তা'হলে দোষী বলে ধরতে হয় অরুণকে। শোনা যায় এই যুবকটি টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় ঘোরাফেরা করে। চেহারাটিও খারাপ নয়। তা'ছাড়া সবিতা তাকে আমল না দিলেও তার মেয়ে বন্ধুর যে অভাব নেই সে খবর অফিসের প্রায় সবাই জানে। এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে আখেরে তার লাভ কি? তা'ছাড়া, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অতিরিক্ত সময় কি তার আছে?

তাহলে তো শেষ পর্যন্ত সব দায়-দায়িত্ব চাপাতে হয় ঐ উঠতি আধুনিক কবি রথীনের ওপর। যে কলম দিয়ে সে কবিতার ফুল ফোটায় সেই কলম দিয়েই কি সে এমনি ভাবে বিষ ঝরিয়েছে? কবিরা কি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়? কে জানে। কবি চরিত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে তারা যে সাধারণতঃ একটু আবেগপ্রবণ হয় তা সে জানে। কিন্তু আবেগপ্রবণ হলেই যে একটি যুবক এমনি একটা কাজ করে বসবে তা কি জোর করে বলা যায়?

দিনের পর দিন সবিতা এমনভাবে মনের মধ্যে চিন্তার জাল ছড়িয়ে দেয় যে সেই জালে মাঝে মধ্যে সে নিজেই আটকে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়। দিশেহারা সবিতা সময় সময় হাঁপিয়ে ওঠে। বিরক্ত হয় নিজের ওপর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে এই বিষয় নিয়ে আর সে ভাবনা-চিন্তা করবে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোন্ ফাঁকে যে মনের মধ্যে এই চিন্তাটা ঢুকে পড়ে তা সে টেরই পায় না।

মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মা নিভাননী চোখের জল ফেলেন। বৌদি বাসন্তী গম্ভীর মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন, কিন্তু সবিতা অটল। ঐ চিঠির লেখককে আগে সে খুঁজে বের করবে, তারপর অন্য চিন্তা। কিন্তু কেমন করে যে তা সম্ভব, কোন পথ ধরে যে তাকে এগোতে হবে তা' সে জানে না। তাই চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে কোনমতে দৈনন্দিনের কাজ-কর্ম করে চলে সবিতা। এ যেন অন্ধের রাজপথ ধরে দৌড়বার চেষ্টা। ইচ্ছে আছে, কিন্তু সামর্থ্য নেই।

পাত্রীর বাড়িতে সেই উড়ো চিঠিটা পাঠানোর দিন কয়েক পরেই পাত্রীর তরফ থেকে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এতে সবচাইতে খুশী হয়েছিলেন লাবণ্যময়ী। এই মেয়েটিকে নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনার জন্যে তিনিই যেমন একদিন সবচাইতে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি ঐ উড়ো চিঠি পাওয়ার পর থেকে বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে সবচাইতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনিই। অবশেষে পাত্রীপক্ষই যখন বিয়ে

ভেঙে দিলে তখন তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ছোটজামাই সন্দীপ কেবল মন্তব্য করেছিলেন, বাব্বাঃ, যেন মিলিটারী মেজাজ, এক কথাতেই নাকচ! যাকগে, আবার মেয়ের খোঁজে বেরোতে হবে দেখছি। তবে ঠিক এরকমটি কি আর মিলবে?

এ ব্যাপারে সবচাইতে বিস্মিত হয়েছিলে ডাঃ সর্বেশ্বর বোস। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, এমন একটা সত্যিকারের ভদ্র পরিবারের মেয়েকে ঘরে আনা বাস্তবিকই ভাগ্যের কথা। ঐ চিঠিটা পেয়েই ওঁরা এত লজ্জিত হয়ে পড়লেন যে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিলেন। তেমন লোক হলে হয়তো ছুটে এসে আমাদের বোঝাতে চাইতো যে ঐ চিঠিটা তাদের শত্রুপক্ষের কাজ। কাজেই বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত নয়।

শ্বশুরের কথায় সন্দীপ কোন জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসলেন। জামাতার মুখের হাসি কিন্তু দৃষ্টি এড়ায় না সর্বেশ্বরের। বলে ওঠেন তিনি, ওকি হাসছো যে?

জবাবে সন্দীপ বললেন, আপনার কথাই হয়তো ঠিক। তবে এমনও তো হতে পারে, চিঠিটা উড়ো হলেও ব্যাপারটা মোটেই মিথ্যে নয়। সেটা এমনিভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তেই বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না।

এ ব্যাপারে সব্যসাচীর নিজের প্রতিক্রিয়া কিন্তু বাস্তবিকই অদ্ভুত। সে খুশি হয়েছে কি হয়নি তা' কিন্তু তাদের পরিবারের কেউই সঠিক বুঝতে পারলে না। হঠাৎ যেন সব্যসাচী এমন গভীর জলের মাছ হয়ে উঠলো যে সন্দীপের মত পাকা ডুবুরীও তার নাগাল পেলেন না। সন্দীপের প্রশ্নের জবাবে হালকা চালে সব্যসাচী কেবল বললে, চালিয়ে যান জামাইবাবু। কোন চিন্তা নেই। আমি পেছনে আছি।

—কি চালিয়ে যেতে বলছো, অসভ্য? বিস্মিত কণ্ঠস্বর সন্দীপের।

হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, পাত্রী খোঁজার কাজ। ইস্, আপনার জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয় জামাইবাবু। এত করে যদিও বা একটিকে বড়শিতে গেঁথে তুললেন তো সেটিকেও ধরে রাখতে পারলেন না।

সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় শোভাবাজারের মোড়ে সব্যসাচীর সঙ্গে যে মেয়েটির দেখা হয়ে গেল তার নাম সবিতা।

এই ঘটনাটিকে যে কেউ আকস্মিক বলে ভাবতে পারলেও সব্যসাচী নিজে জানে

যে এটা মোটেই আকস্মিক নয়। অফিস ছুটির পরে গাড়ি নিয়ে ভবানীপুরে বাড়ি ফেরার বদলে এই অঞ্চলে আসার তার একটিমাত্র কারণই থাকতে পারে, আর সেটি হচ্ছে সবিতার সঙ্গে দেখা করা। তাই আগে থেকেই খবরাখবর নিয়ে বেশ ভেবে-চিন্তে সে এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। গাড়িটাকে একটু দূরে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল আর সেই স্টপে মিনিবাস থেকে নেমে আসা যাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানলেও মনটা কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল তার। উদ্বেগ ঐ সবিতাকে নিয়ে। ব্যাপারটা সবিতা কোন্ দৃষ্টিতে নেবে তা ঠিক বুঝতে পারছিল না সব্যসাচী।

একটু পরেই আবার একটা মিনিবাস এসে দাঁড়ায় সেখানে। সব্যসাচীর চোখ জোড়া তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে আবার। বাস থেকে নেমে আসে অনেক যাত্রী। সবশেষে চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সবিতা নেমে আসতেই সব্যসাচীর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই তো সেই। একটি সদ্য ফোটা পদ্মফুল যেন। যেমনি চেহারা তেমনি দেহের ভঙ্গিমা।

বাস থেকে নেমে গায়ের আঁচলটা ঠিক্ করে নেয় সবিতা। তারপর ক্লান্ত দেহে মরাল গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে ফুটপাথ ধরে।

সহসা সব্যসাচীর কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে সবিতার পেছনে—শুনুন।

থমকে দাঁড়ায় সবিতা। মুখে-চোখে বিস্ময় নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকায়। কে এই লোকটি এমনিভাবে পথের মাঝে তাকে ডাকছে?

সামান্য দ্বিধা দেখা দেয় সব্যসাচীর মনে। পরক্ষণেই সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় সবিতার মুখোমুখি।

দ্বিধা সবিতার মনেও। লোকটিকে পরিচিত মনে না হলেও একেবারে অপরিচিত মনে হয় না। কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে তা ঠিক মনে করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সে বললে, আপনাকে তো ঠিক—

—চিনতে পারছেন না, কেমন? মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বলতে থাকে সব্যসাচী, আপনাদের অফিসে একদিন গিয়েছিলাম আপনাদের ছোটসাহেব সজল মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে।

এতক্ষণে চিনতে পারে সবিতা। স্বাভাবিক আড়ষ্ট ভাবটুকু ততক্ষণে কেটে গেছে তার। গায়ের আঁচলটা আরও একটু টেনে দিয়ে সে বললে, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তা, আপনিও বুঝি এদিকেই থাকেন?

—না, ঠিক থাকি না। একটু দরকারে আসতে হয়েছে এদিকে। বলেই সব্যসাচী একটু সময় চুপ করে থেকে সবিতার মুখের ভাব লক্ষ্য করে। তারপর আবার বললে, সারাদিন অফিসে খাটা-খাটুনির পরে আপনি নিশ্চয়ই দারুণ টায়ার্ড।

হয়তো আপনাকে এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন।

—না—না, বিরক্ত হবো কেন? সবিতার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

সামান্য ইতস্তত করে সব্যসাচী আবার বললে, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

সহসা মুখের হাসিটুকু মুছে যায় সবিতার। সুন্দর ভ্রূ-যুগল ঈষৎ তীর্যক হয়ে ওঠে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন প্রায় অপরিচিত যুবকের মুখে এমনি ধরনের কথায় যারা কিছু মনে করে না সবিতা সেই শ্রেণীর যুবতী নয়।

সবিতার মুখের ভাব লক্ষ্য করে শঙ্কিত কণ্ঠে সব্যসাচী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ডোণ্ট মাইণ্ড প্লিজ। যদি আপনার তেমন কোন তাড়া থাকে তো আজ বরঞ্চ থাক, আর একদিন না হয় হবে।

—না—না, থাকবে কেন? এখনই বলুন। আমাদের অফিস সংক্রান্ত কিছু কথা কি?

সবিতার জবাবে একটু ফাঁপড়ে পড়ে সব্যসাচী। সবিতা যে ধরনের সুরে কথাটা বললে তাতে সেই পরিবেশে তার নিজের বলার কথাগুলো ঠিক খাপ খাবে কিনা বুঝতে না পেরে সে অনেকটা অসহায় চোখে তাকায় সবিতার দিকে।

সব্যসাচীর সেই ভীরু দৃষ্টির সামনে সহসা কেমন যেন উৎসাহ বোধ করে সবিতা। তাই সে আবার বললে, অফিসের কোন ব্যাপার হলে অফিসে গিয়ে বললেই ভালো হয় নাকি?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা' তো বটেই, একটা ঢোক গিলে বলতে থাকে সব্যসাচী, তবে ব্যাপারটা ঠিক অফিসিয়াল নয়। তাই ভাবছিলাম—। যাক গে, আজ বরঞ্চ থাক। আপনি টায়ার্ড। বলেই সব্যসাচী হাত জোড় করে ছোট্ট একটি নমস্কার করে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই কৌতূহল আরও বেড়ে ওঠে সবিতার। অফিসিয়াল যখন নয় তখন নিশ্চয়ই প্রাইভেট কথা। কি সেই প্রাইভেট কথা?

কর্মলিকে ছাড়তে চেষ্টা করলেও কর্মলি এবার ছাড়ে না। সব্যসাচী ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সবিতা দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, বেশ তো, বলুন না।

ফিরে দাঁড়ায় সব্যসাচী। সবিতার চোখে-মুখে তেমন কোন বিরক্তির চিহ্ন লক্ষ্য না করে সে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। মৃদু হেসে সে বললে, কষ্ট করে আমার কথা যখন শুনতে রাজি হয়েছেন তখন আপনাকে আরও একটু কষ্ট করতে হবে। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে তো আর কথা বলা যায় না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো সামনের ঐ চায়ের দোকানটায় চলুন। না—না, মাত্র পাঁচ মিনিট। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নষ্ট করবো না আপনার।

নারীর একটা স্বাভাবিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে যার সাহায্যে সে পুরুষের চাইতে অনেক কিছু বেশি বুঝতে পারে। এটা তার প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতা, অনেকটা হরিণের তীব্র ঘ্রাণশক্তির মত। এর সাহায্যেই হরিণ বহুদূর থেকে বাঘের অস্তিত্ব টের পেয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে।

সব্যসাচীর বলার ভঙ্গিতে বোধহয় এমন কিছু ছিল যা নাকি সেই মুহূর্তে এড়াতে পারছিল না সবিতা। তবুও সে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে। একবার তাকায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুশ্রী যুবকটির মুখের দিকে। না, অবিশ্বাস করার মত কোন কিছু নেই ওখানে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় নির্ভয় হতে পরামর্শ দেয় সবিতাকে। অবশেষে দ্বিধার শেষ রেশটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে ওঠে, বেশ চলুন।

চায়ের দোকানে একটা টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি বসে সব্যসাচী দুটো চায়ের অর্ডার দিতেই সবিতা তীব্র আপত্তির সুরে বলে ওঠে, না, আমার জন্যে নয়। আমি যখন-তখন চা খাই না।

—বেশ তো, তা' হলে একটা কোল্ড ড্রিংক খান। সব্যসাচীর কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

—না, তাও নয়। গম্ভীর শোনায় সবিতার কণ্ঠস্বর।

সব্যসাচী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার পয়সার কিছু খেতে বোধহয় আপনার আপত্তি আছে। অবশ্যি তা থাকাই স্বাভাবিক। একজন প্রায় অপরিচিত লোকের পয়সায় কিছু খেতে কার এমন আগ্রহ থাকে? বিশেষ করে মেয়েদের এসব ব্যাপারে সংকোচ তো একটু বেশিই। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কিছু না খেয়ে চায়ের দোকানে চেয়ার টেবিল দখল করে রাখাও ভালো দেখায় না। আবার আমি খাবো আর আপনি তাকিয়ে থাকবেন তাও যেন কেমন দৃষ্টিকটু। কথাটা শেষ করেই সব্যসাচী বিব্রত ভঙ্গিতে তাকায় সবিতার দিকে।

সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর ঐ বিব্রত ভাবটুকু বেশ খুশি মনেই উপভোগ করছিল সবিতা। নাঃ, লোকটি আর যাই হোক অভদ্র নয়। কিন্তু মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যের আবরণ একটুও না সরিয়ে তেমনি কণ্ঠে সে বললে, চা খেতে খেতে আপনি আপনার কথাটা সেরে ফেলুন। কিছুই দৃষ্টিকটু হবে না।

হঠাৎ যেন একটা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে সব্যসাচী বলে ওঠে, আসুন, আমরা নিজের নিজের পয়সায় চা খাই। এতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

সব্যসাচীর কথার ধরনে মুখের গাম্ভীর্যটুকু আর বজায় রাখতে পারে না সবিতা। মৃদু হেসে সে বললে, বেশ, চায়ের অর্ডার দিন।

—নিজ নিজ পয়সায়?

তেমনি হাসিমুখে সবিতা বললে, হ্যাঁ।

গরম চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দেবার ফাঁকে সব্যসাচী তার বলার কথাগুলো মনে মনে একবার গুছিয়ে নেয়। তারপর মাথা তুলে বললে, কিছু মনে করবেন না, ব্যাপারটা আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

—আমার ব্যক্তিগত, না আপনার? সবিতার কণ্ঠে কৌতূহল।

সব্যসাচী সেকথার জবাব না দিয়ে আবার বললে, একখানা উড়ো চিঠির ওপর নির্ভর করে বিয়েটা না ভেঙে দিলেই কি চলতো না?

চায়ের কাপটা সবে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল সবিতা, কিন্তু সব্যসাচীর কথায় সেটা আর মুখে তোলা হলো না। ঠক্ করে কাপটা প্লেটের ওপর নামিয়ে রেখে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সব্যসাচীর দিকে। বিষয়টি কেবল তার ব্যক্তিগতই নয়, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে সে ভয়ানক স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। যে মিথ্যে কলঙ্ক সবিতার কুমারী মনটিকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে সেই প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই তাকে চঞ্চল করে তোলে। তার ওপর প্রতিকার কিম্বা প্রতিবিধানের কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চঞ্চলতা যেন আরও বেড়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে একজন অপরিচিত লোকের মুখে প্রসঙ্গটির অবতারণা তাকে কেবল অবাকই করে না সন্দিগ্ধও করে তোলে। কে এই ব্যক্তি? কি বলতে চায় সে?

চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সবিতা, আপনি এসব জানলেন কি করে? কে আপনি?

সবিতার ভাব ভঙ্গিতে সত্যিই একটু ঘাবড়ে যায় সব্যসাচী। তাড়াতাড়ি সে জবাব দেয়, বিরক্ত হবেন না, একটু ধৈর্য ধরুন। আমার জানার এক্তিয়ার ছিল বলেই জেনেছি। সবই বলছি। তার আগে চায়ে চুমুক দিন। ওটা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ঠাণ্ডা চা-ই আমি পছন্দ করি, বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বলে ওঠে সবিতা, আপনি আগে সব কথা বলুন।

—হ্যাঁ বলছি, চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে সব্যসাচী বললে, সেই উড়ো চিঠিখানা আমার বাবাকেই লেখা হয়েছিল। আমার নাম সব্যসাচী বোস।

নামটা যেন মন্ত্রের মত কাজ করে সবিতার ওপর। ফণিনীর উদ্যত ফণা প্রশমিত হয়। সেই মুহূর্তে সবিতার আয়ত চোখের বিস্ফারিত তারাদুটি কেবল স্বাভাবিকই হয়ে ওঠে না, নারীর স্বাভাবিক লজ্জায় সেদুটো ঈষৎ সংকুচিত হয়ে আনত হয়ে পড়ে। এক আনন্দঘন মধুর রসের প্রস্রবণের শব্দ যেন সে শুনতে পায় নিজের বুকের মধ্যে। এই সেই মানুষটি যাকে ঘিরে বেশ কয়েকমাস ধরে একটু একটু করে এক মোহময় কল্পনার জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল আপন মনের মধ্যে। এই মানুষটির জন্যেই বরণডালা প্রস্তুত করে সে অপেক্ষা করছিল সেই

বিশেষ দিনটির জন্যে। নিজের অনাঘ্রাত কুমারী মনখানি এই লোকটির উদ্দেশে সমর্পণ করার জন্যেই মনে প্রাণে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু সেই দিনটি তার জীবনে আর এলো না। কোথা দিয়ে যেন কি ঘটে গেল। ঐ চিঠিখানার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সবিতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ভয়ানক এক আক্রোশে নিজের হাতেই সে ভেঙে ফেলেছিল নিজের সেই কল্পনার জগৎ।

লজ্জায় ঈষৎ আরক্ত মুখখানা নীচু করে চুপ করে থাকে সবিতা। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। এরকম একটা অবস্থার মুখোমুখি যে কোনদিন তাকে হতে হবে তা সে ধারণাই করতে পারে নি। মিত্তির সাহেবের সঙ্গে দেখা করার নাম করে এই মানুষটি বোধহয় সেদিন তাকে দেখতেই হাজির হয়েছিল তাদের অফিসে। আর আজ বিয়ে ভাঙার জন্যে হয়তো মনে মনে তার ওপর একটা বিশ্রী ধারণা করে বসে আছে। হয়তো ভেবেছে সবিতার কোন পুরুষ বন্ধুই এ কাজ করেছে। এমনও ভাবতে পারে যে এতে হয়তো সবিতারও সায় ছিল।

কথাটা মনে হতেই লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে সবিতার। ঈশ্বর এ কী বিপদে ফেললেন তাকে ? এখন সে কেমন করে এর জবাব এড়াবে ? মাথা নীচু করে থাকলেও সবিতা স্পষ্ট টের পায় সব্যসাচী জবাবের আশায় তার দিকেই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব্যসাচীই তাকে জবাব দেওয়ার হাত থেকে রেহাই দিলে। ম্লান কণ্ঠে সে বললে, আপনাদের আইনে একজনের অপরাধে আর একজন শাস্তি পায় এটা কিন্তু আমার জানা ছিল না। কে কোথায় চিঠি লিখে আপনাকে অপমান করলে, আর তার জন্যে আপনি বিয়েটাই ভেঙে দিলেন। এতে যে সেই উড়োচিঠির লেখকের উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়েছে তা' কি একবার ভেবে দেখেছেন ?

সবিতাকে স্পষ্ট অনুযোগ করেছে সব্যসাচী। কিন্তু অনুযোগ যে এমন মধুর হতে পারে তা' এতদিন বাস্তবিকই জানা ছিল না সবিতার। বিয়ে ভেঙে দিয়ে সবিতা যেন শাস্তি দিয়েছে সব্যসাচীকে। তার সম্পর্কে এই সুপুরুষ যুবকটির যে এমন আগ্রহ থাকতে পারে তা' সে কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। তা'হলে কি এরা সেই চিঠিটার একটি বর্ণও বিশ্বাস করে নি ? তা'হলে কি সেদিন হঠাৎ বিয়ে ভেঙে দিয়ে সবিতা ভুল করেছে ? সেদিন সে এদের সেই আগ্রহকেই কি দয়া কিম্বা অনুকম্পা বলে ভুল করেছিল ?

এতক্ষণে ধীরে ধীরে মাথা তোলে সবিতা। ভীরু চোখে সব্যসাচীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর চায়ের কাপের ওপর চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বললে, সেদিন এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কলঙ্ক যতই মিথ্যে হোক, মিথ্যে প্রতিপন্ন না হওয়া অবধি তাকে সত্য বলেই সবাই ধরে নেয়।

—না, সবাই নয়, কেউ কেউ, বলতে থাকে সব্যসাচী, এ ক্ষেত্রেও কি প্রমাণ করতে পারলেন যে সেটা মিথ্যে ?

তেমনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, না পারি নি। চিঠির লেখককে খুঁজে না পেলে তা' তো সম্ভব নয়।

—কি করে তাকে খুঁজে বের করবেন বলে মনে করেছেন ?

অসহায় ভঙ্গিতে জবাব দেয় সবিতা, তা তো জানিনা। তবে তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না।

— আর তাই বুঝি অশান্ত মন নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হলেন না ?

সবিতা কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে।

সব্যসাচী আবার জিজ্ঞেস করে, চিঠিটা আপনি নিজে পড়েছেন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা। সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, চিঠির হাতের লেখা দেখে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার ?

— না তো। মাথা নাড়ে সবিতা।

—কাউকে না ? আপনার আত্মীয়-স্বজন কিম্বা অফিসের কাউকেও না ?

—মনে তো হয় না। তেমনি হতাশ সুর সবিতার।

—তা'হলে আপনি সেই লেখককে খুঁজে বের করবেন কেমন করে ?

—আমিও তো তাই ভাবছি। হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়ে ওঠে সবিতা। এই লোকটির কাছে নিজের অসহায়তা প্রকাশ হয়ে পড়তেই তার এই লজ্জা।

সব্যসাচী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, এক্সকিউজ মী, কিছু মনে করবেন না। মেয়েদের দিয়ে আর যা হোক গোয়েন্দাগিরি সম্ভব নয়।

—এর মধ্যে আবার গোয়েন্দাগিরি এলো কেমন করে ?

—বারে, এই রহস্যের সমাধান করা কি গোয়েন্দা ছাড়া সম্ভব ?

মেয়েদের সম্পর্কে সব্যসাচীর এই অভিমত যেন ঠিক মেনে নিতে পারে না সবিতা। তাই সে বললে, আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন। সার্থক গোয়েন্দা মেয়েরাই হতে পারে।

এতক্ষণে সবিতার সেই জড়তা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। তাই সে কথাটা বেশ সহজভাবেই বললে।

মৃদু হেসে সব্যসাচী জবাব দেয়, ভেবে দেখুন, সেই শার্লক হোমস থেকে শুরু করে এদেশের ব্যোমকেশ মায় ফেলুদা পর্যন্ত সবাই পুরুষ। এদের সমকক্ষ একজন মেয়ে গোয়েন্দার নাম করতে পারেন ?

—কেন, মাতাহারি ? বলতে থাকে সবিতা, শোনা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

এই মহিলার গোয়েন্দাগিরিতে বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষরা নাকি ঘায়েল হয়েছিলেন।

—মাতাহারি তো গোয়েন্দা ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্পাই—গুপ্তচর। গোয়েন্দাগিরি আর গুপ্তচরবৃত্তি কি এক হলো?

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারে সবিতা।

আবার একটু সময় চুপ করে থাকে সব্যসাচী। তারপর বললে, ভেবেছিলাম ঐ চিঠির ব্যাপারে আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিজের কৌতূহল মেটাবো। এখন দেখছি কৌতূহল মেটাতে হলে নিজেকেই গোয়েন্দাগিরিতে নামতে হবে।

সব্যসাচীর কথা শেষ হতেই সবিতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সত্যি বলছেন? আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন?

—যদি আপনি চান।

—হ্যাঁ, চাই। কথাটা বলে ফেলেই সবিতা সতর্ক হয়ে উঠে কথাটাকে ঘুরিয়ে আবার বললে, হ্যাঁ, যদি আপনার ইচ্ছে হয়।

—আমার সাহায্য পেতে হলে কিন্তু আমার নির্দেশমত আপনাকে চলতে হবে। এতে আপনি রাজি তো?

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে সবিতা, কি সেই নির্দেশ?

একটু ভেবে নিয়ে সব্যসাচী বললে, দু'সপ্তাহ সময় পাবেন আপনি। এর মধ্যে আপনাকে আপনার সেইসব বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে যাদের সম্পর্কে আপনার মনে এতটুকু সন্দেহও আছে। তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই আপনাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে প্রথমে। তারপর আমরা চোখ ফেরাবো অন্যদিকে।

—বেশ, তাই হবে। খুশি মনে জবাব দেয় সবিতা।

—প্রত্যেক(?) এই সময় এই দোকানেই আবার আমাদের দেখা হবে, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

—আর, তেমন কোন জরুরী দরকার পড়লে আমাকে টেলিফোনে খবর দেবেন। কথাটা বলেই সব্যসাচী পকেট থেকে নিজের নামাঙ্কিত কার্ড বের করে সবিতার হাতে তুলে দেয়।

অবশেষে বিদায়ের পালা। এতদিনে ঐ উড়ো চিঠি সম্পর্কে একটা পথের সন্ধান হতে চলেছে মনে করে খুশি হয়ে ওঠে সবিতা। নিজের বোঝার অংশ অন্যকে ঘাড়ে নিতে দেখলে মানুষ মাত্রই খুশি হয়ে ওঠে। খুশি হয় সব্যসাচীও। অবশ্য, তার খুশির কারণ ভিন্ন। গোটা ব্যাপারটাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনতে পেরেই সে খুশি। সেই সঙ্গে অবশ্য কিছু দায়িত্বও এসে পড়লো তার

ঘাড়ে। গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব। তা, আর কি করা যাবে। মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষকে বরাবরই তো দায়িত্ব নিতে হয়। এটাই তো সংসারের নিয়ম।

চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিতে এসে সব্যসাচী মৃদু হেসে সবিতাকে বললে, কথা ছিল নিজের চায়ের পয়সা নিজেকে দিতে হবে, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

—কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যেহেতু দুটো চায়ের অর্ডার-ই আমি দিয়েছি এবং যেহেতু আপনি ঠাণ্ডা চা পছন্দ করেন ঘোষণা করেও শেষপর্যন্ত সেই জুড়িয়ে যাওয়া চা স্পর্শ না করেই উঠে এলেন, তাই আইনতঃ দুটোর দামই আমাকে দিতে হয়, কি বলেন?

কোন জবাব না দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে কেবল মাথা নীচু করে সবিতা।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে সবিতা অনেকদিন পরে বেশ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল।

(দশ)

গোয়েন্দাগিরি—মেয়ে গোয়েন্দা—শার্লক হোমস। ইদানীং এ ধরনের কথাগুলো প্রায়ই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে সবিতার। সব্যসাচীর বলে দেওয়া কথাগুলোর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। পরিচিত সন্দেহভাজন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের মনের কথা টেনে বের করতে হবে। সোজা কথায়, গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। আবার, এমনভাবে এ কাজ করতে হবে যাতে তারা কিছু টের না পায়।

কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও তো নেই। তার ভাগ্য ভালো যে সব্যসাচী এ কাজে তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। নইলে এতদিন তো সে অন্ধকারের মধ্যেই কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। কাজেই সব্যসাচীর নির্দেশ পালন না করলেই নয়। কাজটা কঠিন বলে না করে উপায় নেই।

সেটা ছিল এক ছুটির দিন। এমনিতে সবিতা তার আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি যায় না বললেই চলে। তাই সেই ছুটির দিন সবিতাকে হঠাৎ নিজের বাড়িতে

দেখে বিস্ময় আর চাপতে পারলেন না কাত্যায়নী। বলেই ফেললেন তিনি, ব্যাপার কি ? সূর্য আজ কোন্ দিকে উঠেছে ? তুই আজ হঠাৎ এখানে ?

কাতুপিসির এমনি ধরনের অভ্যর্থনার ঘটায় সেই মুহূর্তে একটু বিব্রত বোধ না করে পারে না সবিতা। মনের ভাব চেপে শুকনো হাসি হেসে সে বললে, কেন, পিসির বাড়ি আসতে নেই নাকি ?

—না—না, বলতে থাকেন কাতুপিসি, তা' থাকবে না কেন ? তবে বহুকাল তো এদিকে আসিস নি। তা' এসেছিস যখন, ভেতরে আয়, এসে বোস্।

কাত্যায়নীর শোবার ঘরে একখানা টুলের ওপর সবিতা বসতেই কাত্যায়নী নিজে একটা বেতের মোড়া টেনে তার মুখোমুখি বসেন। এদিকে সবিতার আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেই একান্নবর্তী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হয় সেখানে। সবিতা তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে যে তারা মনের কৌতূহল চেপে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভেঙে যাওয়া বিয়ের কনেকে দেখতেই বোধহয় তাদের এই কৌতূহল।

জিজ্ঞেস করেন কাত্যায়নী, কেমন আছিস তোরা ? তোর মা কেমন আছে ?

—ভালো। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সবিতা।

—বিয়ে তো ভেঙে গেল। আর কোথাও পাত্তর-টাত্তর দেখছে নাকি তোর বৌদি ?

—জানি না। এবারেও তেমনি সংক্ষিপ্ত জবাব সবিতার।

—তুই না জানলেও তোর বৌদি যে এর মধ্যেই আবার দেখাশোনা করতে শুরু করে দিয়েছে তা' আমি অনায়াসেই বলে দিতে পারি। তা', হ্যাঁরে সবু, চিঠিটা কে লিখেছে জানতে পারলি কিছু ?

সেই চিঠিটার প্রসঙ্গ সবিতার কাছে অসহ্য, বিশেষকরে একঘর মেয়েদের মধ্যে ঐ প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই সবিতার সংকোচ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সংকোচ করলে চলবে না। ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা যে অনিবার্য তা' জেনে-শুনেই সবিতা এখানে এসেছে। সত্যি বলতে কি, সে নিজেও ঐ আলোচনাই চাইছিল। লেখকের খোঁজ পেতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কি ?

মনের দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবিতা জোর করে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে হালকা সুরে জবাব দেয়, না পিসিমা, এখনও জানতে পারি নি। তা'ছাড়া জানার জন্যে তেমন একটা উদগ্রীবও নই আমরা। তবে যে-ই ঐ চিঠি লিখে থাকুক সে আমাদের উপকারই করেছে।

—উপকার ? বলিস কিরে ? বিয়ে ভেঙে দিয়ে সে উপকার করেছে ? কাত্যায়নীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। সবিতা লক্ষ্য করে সেই চিহ্ন উপস্থিত অনেকেরই মুখে।

—হ্যাঁ পিসিমা, জবাবে তেমনি সুরে বলতে থাকে সবিতা, বিয়ের কথাবার্তা তো পাকা। কেনাকাটাও অনেক হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন দাদার কানে পাত্র সম্পর্কে একটা খবর আসতেই দাদা ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন। পাত্রের স্বভাব-চরিত্র নাকি তেমন ভালো নয়। এই অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দিয়ে বদনামের ভাগী হতে চাইলেন না তিনি। আবার ঐ ঘরে আমাকে পাঠাতেও তিনি রাজি নন। এমনি যখন দোটানা অবস্থা, তখন হঠাৎ পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে ঐ চিঠি এলো। চিঠিতে আমার সম্পর্কে অনেক কথাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠির ঐ বক্তব্যকে লুফে নিলেন দাদা। বললেন তাঁদের, এই চিঠি পাওয়ার পরে আপনাদের পক্ষে আমার বোনকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই বিয়ে হতে পারে না।

নির্জলা মিথ্যেগুলো এক নিঃশ্বাসে জলের মত বলে দিয়ে সবিতা এমন একটা ভঙ্গি করে যেন এতে সে নিজেও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সেই মুহূর্তে এমন মিথ্যে-গুলো স্বচ্ছন্দে বলতে পারার কৃতিত্বে সে নিজের ওপরেই খুশি হয়ে ওঠে। কথাটা শেষ করেই সে তার কাতুপিসির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করার চেষ্টা করে।

কাত্যায়নী একটু সময় চুপ করে থাকেন। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, বুঝতে পারছি চিঠিটা তোকে বাঁচিয়েছে।

—বাঁচিয়েছে বলে বাঁচিয়েছে! কৃতজ্ঞ-ভরা কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, সেই চিঠির লেখক আমার অশেষ কল্যাণ করেছে। তার কাছে আমি চির-ঋণী হয়ে রইলাম।

—কিন্তু সে তো তোর অনিষ্ট করতেই চেয়েছিল।

—হ্যাঁ চেয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন শাপে বর হয়ে উঠবে তা সে বুঝবে কেমন করে? দাদা তো সেদিন বলেই ফেললেন, সেই লেখক না জেনে যে উপকার আমাদের করেছে তাতে আমার নামে অপবাদ দেওয়ার দোষ তার কেটে গেছে।

একটার পর একটা টোপ ফেলে চলেছে সবিতা। মনে আশা, কাতুপিসি যদি হঠাৎ বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন। নিদেন পক্ষে এই খবরে তাঁর মুখে-চোখে যদি আনন্দের কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে। কিন্তু তেমন কিছু না দেখে মনে মনে বাস্তবিকই একটু নিরাশ হয় সে। অবশেষে সে মনে মনে বলে, এই মহিলার কাছ থেকে কিছু বের করা সহজ নয়। এর জন্যে তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

ততক্ষণে ঘরের ভিড় অনেকটাই পাতলা হয়ে উঠেছিল। চা ও সেই সঙ্গে কিছু জলখাবার এলো সবিতার জন্যে। সবিতা কিছুই খাবে না, কাত্যায়নীও ছাড়বেন না। অবশেষে সামান্য কিছু মুখে তুলতেই হলো সবিতাকে।

খেতে খেতে সবিতা সহজভাবেই কথা বলতে থাকে তার কাতুপিসির সঙ্গে। হঠাৎ কাত্যায়নী এক সময় বলে ওঠেন, ভেবেছিলাম তুই আমাদের ঘরে আসবি। মণ্টা আমার সোনার টুকরো ছেলে। বৌঠাকুরণেরও তো সেই ইচ্ছেই ছিল। কিন্তু বাদ সাধলে তোর মাস্টারনী বৌদি। এমন ভাব দেখালে যেন আমার মণ্টা একেবারে ফেলনা। শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙ্গে গেল। এই এতটা বয়স পর্যন্ত তো দেখলাম না যে আমার মনে কষ্ট দিয়ে কারুর কোন কাজ সুষ্ঠু-ভাবে হয়েছে। শেষে হয়তো তোকে এই বাড়িতেই আসতে হবে। ঠাকুরের মনে হয়তো সেই ইচ্ছেই আছে। কথাটা শেষ করে ক্যাতায়নী হাত জোড় করে তাঁর ঠাকুরের উদ্দেশেই হয়তো প্রণাম করেন।

সবিতা মাথা নীচু করে থাকে। মনে তার হাজারো চিন্তা। টোপ ফেলে সরাসরি মাছটাকে টেনে তুলতে না পারলেও মাছের অস্তিত্ব যেন সে টের পাচ্ছে। তবে কি মণ্টা ঐ চিঠির জন্যে দায়ী? হয়তো এই কাতুপিসিই তাকে সেই বুদ্ধি দিয়েছে। এই মহিলার অসাধ্য তো কোন কাজ নেই। আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে উনি সবকিছু করতে পারেন। মণ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে হয়তো খানিকটা হদিশ মিলতো। কিন্তু তা' কিছুতেই সম্ভব… সবিতার পক্ষে।

দিন কয়েক ঐ কাতুপিসি ও মণ্টার কথাই মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে সবিতার। কখনও মনে হয় সব্যসাচীর নামে অমন মিথ্যে বদনাম দেওয়া ঠিক হয়নি। ভদ্রলোক কোনরকমে টের পেলে নির্ঘাৎ রেগে যাবেন। কিন্তু উপায় কি? কাতুপিসির সামনে ভালো টোপ ফেলতে গিয়ে হঠাৎই কথাটা তার মাথায় এসেছিল। যাকগে, এ নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। কাতুপিসি ও মণ্টার কথা সে জানাবে নাকি সব্যসাচীকে? কিন্তু কেমন করে জানাবে? সব্যসাচীর সঙ্গে সেই চায়ের দোকানে আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। অবশ্য সে টেলিফোনে জানাতে পারে। থাক্, এত তাড়াতাড়ি টেলিফোন করলে ভদ্রলোক হয়তো অন্যকিছু মনে করতে পারে।

সত্যিকারের গোয়েন্দাদের একচোখ হরিণের মত হলে চলে না। সবদিকে নজর রাখতে হয় তাদের। সেই নিয়মে সবিতাও কেবল তার কাতুপিসি ও তাঁর দেওরপো মণ্টার দিকে নজর না দিয়ে অন্যদিকেও নজর দিতে চেষ্টা করে। অন্যদিক মানে তার অফিসের দিক্। সেখানে অমল, দিব্যেন্দু, অরুণ, রথীনের মত লোকেরা রয়েছে। ওদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করতে পারে। লাভ-লোকসানের হিসেব না কষে কেবলমাত্র সবিতাকে একটু বিপাকে ফেলতে গিয়েই হয়তো ওদের মধ্যে কেউ কাজটা করেছে। কিন্তু কে করেছে সেটাই প্রশ্ন। কাকে সন্দেহ হয় সবিতার? কাকে যে সন্দেহ হয় এবং কাকে যে হয় না সেটাই

এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলে না সে। কিন্তু নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত গোয়েন্দারা নাকি কাউকেই সন্দেহ থেকে রেহাই দেয় না। সেই সূত্র অনুযায়ী সবিতা ইদানীং অফিসের অনেকের ওপরেই নজর রাখে। বিশেষ করে ঐ চারজনের ওপর তো বটেই। এমনকি সেই উদ্দেশ্যে ইদানীং অফিসের অনেকের সঙ্গেই একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে সে এগিয়ে যায়। সবিতার রকম সকম দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এ নিয়ে মুখ টেপাটেপিও করে। বলে, বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় বেচারা বোধহয় মনের দুঃখে প্রজাপতি সেজে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবার সংকল্প করেছে। তাই বোধহয় আজকাল গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে ঐ পরমেশ বেয়ারার সঙ্গে পর্যন্ত গল্প করে। এতকাল যাদের দেখলে মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকতো, আজকাল তাদের ডেকে হেসে কথা বলে—গল্প করে।

ব্যাপারটা মোটেই মিথ্যে নয়। সবিতার অফিসঘরে আজকাল অনেকেই আসে। আগে কেবল আসতো অমল বাগচী। এখন দিব্যেন্দু, অরুণ, রথীন তো আছেই, তাছাড়া আরও দুচারজন সময় পেলেই এসে সবিতার ঘরে ঢুঁ মেরে যায়। গোয়েন্দার চোখ ও কান নিয়ে সবিতা বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই মেশে তাদের সঙ্গে। তাদের প্রতিটি আচার-আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যালোচনা করে নিজের মনের মধ্যে।

এত করেও কিন্তু ইপ্সীত ফল-লাভ ঘটে না সবিতার। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই সে থেকে যায়। আজ যাকে নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহের দানা বাঁধে, কাল সেই দানাগুলো জমাট বাধার আগেই কেমন যেন পানশে হয়ে ওঠে। সন্দেহের দানাগুলো জায়গা পরিবর্তন করে গিয়ে হাজির হয় অন্যের ওপর। এমনিভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। কাজের কাজ কিছুই হয় না, মাঝখান থেকে কেবল হাঁপিয়ে ওঠে সে। গোয়েন্দাগিরির যে এত জ্বালা তা এর আগে সবিতা কখনও বুঝতে পারে নি।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে ধৈর্য রাখা দায়। চিঠির লেখককে খুঁজে বের করার ঐকান্তিকতায় মোটেই ঘাটতি নেই সবিতার। কিন্তু এ ব্যাপারে কোথাও কোন আলোর চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে ক্রমেই যেন সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সময় সময় ঐ সব্যসাচীর ওপরই তার রাগ হয়। লোকটি ভয়ানক স্বার্থপর। সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে এখন দিব্বি চুপ করে বসে রয়েছে। আর সবিতা এদিকে গোয়েন্দাগিরির নামে যাকে তাকে সন্দেহ করে নিজের মনে একটা সন্দেহের পাহাড় গড়ে তুলে তাতে প্রতিনিয়ত ধাক্কা খেতে খেতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এমনিভাবে চলতে থাকলে সবিতা তো কোন ছাড় খোদ শার্লক হোমসের পক্ষেও যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তা বুঝবার মত বুদ্ধিটুকু অন্ততঃ তার আছে।

অবশেষে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে একদিন সে টেলিফোনে ডেকেই বসে সব্যসাচীকে। রণংদেহী মূর্তিতে বেশ চড়া সুরেই সে প্রশ্ন করে, সব্যসাচীবাবু আছেন ?

সব্যসাচীর বরাত ভালো যে সবিতার সেই রণংদেহী মূর্তি টেলিফোনের মাধ্যমে তার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। তবে তার সেই কণ্ঠস্বর কানে পেঁাছতেই সে সচকিত হয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ-বলছি।

—আমি সবিতা—সবিতা ঘোষ।

—সবিতা ? কোন্ সবিতা ? ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ। এবার চিনতে পেরেছি। তা আপনি কি—

সব্যসাচীর কথা শেষ হবার আগেই প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সবিতা, বেশ লোক আপনি। এখন যে প্রায় চিনতেই পারছেন না। গাছে তুলে দিয়ে দিব্বি মই কেড়ে নিয়ে বসে আছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ে সবিতা। ছি—ছি, ভদ্রলোক তার সম্পর্কে কী ভাবলেন! তাদের মধ্যে এমন পরিচয় এখনও হয় নি যে ঐ ধরনের কথা সে বলতে পারে তাকে। তাই কণ্ঠস্বর খাটো করে সে আবার বললে, এক্সকিউজ মী, কিছু মনে করবেন না। আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলে আপনি আড়ালে রইলেন। আমি যে এদিকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

—ও—এই কথা ! সব্যসাচীর কণ্ঠে হালকা সুর। আমাকে একটা খবর দিলেই তো পারতেন। তা, কোন রকম সূত্র জোগাড় করতে পেরেছেন কি ?

—না, কিছু না।

—একেবারেই কিছু না ?

—একেবারে যে কিছু না, তা অবিশ্যি বলতে পারি না।

—দ্যাটস্ রাইট। তা হলে বোঝা যাচ্ছে কিছু সূত্র নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

—সূত্র-টূত্র বুঝি না। তবে অনেকের ওপরই সন্দেহ হচ্ছে।

—কি নাম তাদের ?

একটু সময় চুপ করে থাকে সবিতা। তারপর জবাব দেয়, টেলিফোনেই আপনি সমস্যার সমাধান করতে চান নাকি ?

সব্যসাচী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আই এ্যাম সরি। এ সব কথা টেলিফোনে হয় না। ঠিক আছে, আজ একবার আসুন আপনাদের পাড়ার সেই চায়ের দোকানে। সেখানে বসেই কথা হবে।

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই মনটা কেন যেন হাল্কা হয়ে ওঠে সবিতার। একটা দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধ থেকে সরে গেলে মানুষ যে ধরনের

হালকা বোধ করে এ যেন অনেকটা তাই, কিম্বা তার চাইতেও কিছু বেশি। এই বেশির কারণটুকু সম্ভবত মনের এমন এক চোরকুঠুরীতে আবদ্ধ যার খবর কেবলমাত্র কোন কুমারী মেয়ে ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

অফিস ছুটির পরে একটুও দেরি করেনি সবিতা। তবুও কিন্তু সেই চায়ের দোকানে পেঁছিতে অন্যদিনের চেয়ে বেশ একটু দেরি হলো তার। মিনিবাস থেকে নেমেই একজোড়া সন্ধানী চোখের দৃষ্টিতে দূরের সেই চা-দোকানের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে। ঐ তো সেই লোকটি। চা-দোকানের সামনের ফুটপাথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

সবিতার ওপর চোখ পড়তেই সব্যসাচীর ঋজু দেহটা একটু নড়ে ওঠে। হাতের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে কয়েক পা এগিয়ে আসে সবিতার দিকে। ব্রীড়া সংকুচিতা নারীর মত সহসা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে সবিতা। ভারি লাগে নিজের পা' দুখানা। পরক্ষণেই সংকোচটুকু কাটিয়ে উঠে সব্যসাচীর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ তুলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?

—প্রায় আধ ঘণ্টা। জবাব দেয় সব্যসাচী।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সবিতা লজ্জিত কণ্ঠে বললে, বাস্তবিকই দুঃখিত। চেষ্টা করলাম তাড়াতাড়ি আসতে, কিন্তু আজই দেরি হয়ে গেল। তা, আপনিই বা এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে ? অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল নাকি ?

—না—না, জবাব দেয় সব্যসাচী। তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে আবার বললে, পাছে দেরি করে ফেলি তাই অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। শোনা যায় এমনি ধরনের ব্যাপারে স্বয়ং শার্লক হোমসও নাকি কখনও দেরি করতেন না। কথাটা শেষ করেই একটু জোরে হেসে ওঠে সে।

সবিতাও মৃদু হেসে জবাব দেয়, কিন্তু কোনান ডয়েল মশাই যে শার্লক হোমসকে আমাদের মত এমন একটা পরিস্থিতিতে কখনও ফেলেছিলেন তেমন কিছু কোথাও পড়েছি বলে তো মনে করতে পারছি না।

—তাই নাকি ? সেই চায়ের দোকানের দিকে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে কৃত্রিম সুরে সব্যসাচী বললে, তাহলে বোধহয় আমার কিছু ভুল হলো। কোনান ডয়েল নন, আমাদের শরদিন্দুবাবু বোধহয় ব্যোমকেশকে ফেলেছিলেন এমন একটা অবস্থায়।

—উহুঁ, তেমন কিছুও তো মনে করতে পারছি না। সবিতার কণ্ঠে কৌতুকের সুর।

—তাই বুঝি? তা'হলে তো খুবই মুশকিলে ফেললেন। সঠিক ব্যাপারটা সঠিক সময় কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। হ্যাঁ—এবার মনে পড়েছে। সত্যজিৎ রায় বোধহয় আমাদের ফেলুদাকে—

সব্যসাচী ও সবিতা তৎক্ষণে সেই চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছে। একটা ছোট্ট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসতে বসতে সবিতা সব্যসাচীর কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, না, এবারও হলো না। তার চাইতে বলুন সেই অজ্ঞাত পত্রলেখক একমাত্র একালের শার্লক হোম্‌স অর্থাৎ আপনাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছে। কথাটা শেষ হতেই সবিতা ও সব্যসাচী দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়ায়। সব্যসাচী সবিতার দিকে তাকিয়ে বললে, চায়ের অর্ডার দেব?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

—আমার পয়সায়? মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী।

—জানি না। কৃত্রিম কোপে মুখ ফেরায় সবিতা।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সব্যসাচী। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাল্‌কা সুরে এবার জিজ্ঞেস করে সবিতাকে, আমি যদি শার্লক হোম্‌স হই তা'হলে আপনি তো হচ্ছেন ওয়াট্‌সন। এবার তা'হলে বলুন মিঃ ওয়াটসন, আপনি এতদিনে কোন্ সূত্র জোগাড় করতে পেরেছেন।

সব্যসাচীর প্রশ্নে সবিতার মুখের ওপর থেকে হাল্‌কা ভাবটুকু সরে যায়। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সিরিয়াস কণ্ঠে সে জবাব দেয়, কোন সূত্রই জোগাড় করতে পারি নি।

—কাউকে সন্দেহও হয় না আপনার?

—তা হবে না কেন?

—কে সে? আপনার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ?

একটু দ্বিধা করে সবিতা। তারপর জবাব দেয়, হ্যাঁ। আমার নিকট আত্মীয়া। আমার নিঃসন্তান পিসিমা যিনি নাকি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন।

—পিসিমা ভাইঝির নামে এমন বদনাম ছড়িয়েছে?

—ছড়িয়েছে কিনা জানি না। তবে আমার সন্দেহ হয়।

—কেন?

আবার একটু সময় চুপ্ করে থাকে সবিতা। সব্যসাচী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, থাক্—থাক্, কারণ বলতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তো শুনতে চাই না। আমি ঠিক্ আন্দাজ করে নিতে পারবো।

—আন্দাজ করতে পারবেন? বেশ, বলুন তো কারণটা কি হতে পারে?

—ফ্যামিলি ট্রাবলস। নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দেয় সব্যসাচী।

—ওটা তো একটা সাধারণ কথা। ট্রাবল্ তো অনেক রকম হতে পারে। বলুন তো কি ধরনের ট্রাবল?

সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দেয় সব্যসাচী। তাকায় সবিতার দিকে। তারপর বলে ওঠে, তিনি বোধ হয় তাঁর কোন পছন্দমত পাত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আপনারা বোধহয় তাতে রাজি হন নি।

অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে সবিতা তাকিয়ে থাকে সব্যসাচীর মুখের দিকে। এই লোকটি হাত গুণতে জানে নাকি?

সব্যসাচী সবিতার মুখের চেহারা দেখে হেসে উঠে বললে, কি, অমনভাবে তাকিয়ে রইলেন কেন? ভুল হয়েছে নাকি?

বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, না, একটুও ভুল হয় নি আপনার। কেবল ভাবছি, আপনি একথা জানলেন কেমন করে? কারুর কাছে শুনেছেন নাকি?

—সে সুযোগ আমার কোথায়?

—তবে?

—সাধারণ বিচার-বিশ্লেষণ করে।

—কেমন বিচার বিশ্লেষণ? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর সবিতার।

একটু সময় চুপ্ করে থেকে বলার কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয় সব্যসাচী। তারপর বলতে থাকে, দেখুন, একটু ধীরভাবে বিচার করলে যে কেউ একথা বলে দিতে পারে। বিয়ের ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনেরা ভাঙ্চি দেয় সাধারণতঃ যে তিনটি কারণে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঈর্ষা। নিজের মেয়ে বা ঐ জাতীয় কারুর ভালো ঘরে বিয়ে হয় নি, তাই অন্যের ভালো ঘরে বিয়ের খবরে ঈর্ষার জ্বালায় এধরনের কাজ করে বসে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে শত্রুতা। আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ঘোর শত্রুতা থাকলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। শেষ কারণটি হচ্ছে স্বার্থ। বিয়ের ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধির অর্থই হলো কোন বিশেষ পাত্রের সঙ্গে পাত্রীর বিয়ের ব্যবস্থা করা যাতে তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে। আপনার পিসিমার ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি কারণ যখন প্রযোজ্য নয় তখন একমাত্র তৃতীয়টির সম্ভাবনাই বেশি।

—আপনি জানলেন কি করে যে আমার পিসিমার ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি কারণ প্রযোজ্য নয়? জেরা করার সুরে প্রশ্ন করে সবিতা।

সুচতুর সাক্ষীর মত জবাব দেয় সব্যসাচী, অতি সহজে। আপনি নিজেই বলেছেন যে আপনার পিসিমা নাকি নিঃসন্তান। কাজেই প্রথম কারণটি প্রযোজ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

—বেশ, মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে সবিতা, কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি তো প্রযোজ্য হতে পারে।

—না, পারে না। আপনার পিসিমার সঙ্গে যদি আপনাদের তেমন কোন শত্রুতাই থাকতো তা'হলে তিনি প্রায়ই আপনাদের বাড়ি আসতেন না। আপনিই বলেছেন যে তিনি নাকি আপনাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। সম্ভবতঃ প্রত্যাখ্যাত হবার পরেই তিনি যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সবিতার মুখে আর কথা সরে না। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে কেবল তাকিয়ে থাকে সব্যসাচীর দিকে। বাস্তবিকই অদ্ভুত বিচার শক্তি এই লোকটির। সেই মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে এই লোকটির সাহায্যে হয়তো সে সেই পত্রলেখককে একদিন খুঁজে বের করতে সমর্থ হবে।

সবিতার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হাল্কা সুরে সব্যসাচী বললে, শার্লক হোম্‌সের ক্ষমতার কথা ভাবছেন. বুঝি? কিন্তু মনে রাখবেন কেবল শার্লক হোম্‌স-ই নয়, ওয়াট্‌সনও কোনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি।

এবার সবিতাও হালকা চালে জবাব দেয়, মাপ করবেন, আপনার মধ্যে শার্লক হোম্‌সের দক্ষতা থাকলেও আমার মধ্যে কিন্তু ওয়াট্‌সনের ছিঁটেফোঁটাও নেই।

—নিশ্চয়ই আছে, জবাব দেয় সব্যসাচী, ঠিক জায়গায় ঠিক সময় তা' প্রকাশ পাবে। এবার বলুন, আপনার পিসিমার পছন্দ করা পাত্রটি কে?

ঈষৎ লজ্জিত সুরে সবিতা বললে, তাঁর দেওর পো।

—কি নাম তার?

—মন্টা গুহ।

—কি কাজ করে?

—শুনতে পাই বাঁধাধরা তেমন কিছু করে না। তবে নাকি প্রচুর রোজগার করে।

—আপনার কি সন্দেহ যে ঐ চিঠি আপনার পিসিমা নিজের হাতে লিখেছেন?

—না—না, আমার পিসিমা সেকেলে মানুষ। লিখতে-পড়তে একধু-আধটু জানলেও অমনভাবে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা তাঁর নেই। তা'ছাড়া, তার লেখা আমি চিনি। ঐ লেখা কিছুতেই তাঁর নয়।

—তবে সেই মন্টা গুহর হতে পারে?

—তা' হয়তো পারে।

একটু সময় চিন্তা করে সব্যসাচী। আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দেয়। নতুন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আবার বললে, বেশ বুঝলাম। আর কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সবিতা জবাব দেয়, আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এ কাজ করার মত আর কেউ আছে বলে তো মনে হয় না।

—অফিসের কেউ ?

চুপ করে থাকে সবিতা। তাড়া দেয় সব্যসাচী, চুপ করে রইলেন কেন ? একটা কিছু জবাব দিন।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, কার নাম করবো, বলুন। কে যে হতে পারে আর কে যে পারে না বুঝতে পারছি না।

—তার মানে, আপনার অফিসের কিছু লোককে আপনার সন্দেহ হয়, কেমন ?

মুখে জবাব না দিয়ে সবিতা এবার ঘাড় নাড়ে।

সব্যসাচী আবার বললে, মাপ করবেন, সত্যের খাতিরে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস না করে পারছি না। আচ্ছা, অফিসে যাদের আপনার সন্দেহ হয় তারা কি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতো ?

এবারেও ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

—তাদের নামগুলো প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

সবিতা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, আপত্তির আর কি থাকবে ? তবে, একটা কথা বুঝতে পারছি না, এ ব্যাপারে যাদের সন্দেহ হয় তাদের মধ্যেই যে কেউ ঐ চিঠি লিখেছে তা প্রমাণ হবে কেমন করে ?

—কেন, হাতের লেখা দেখে।

—খালি চোখে কেবল হাতের লেখা দেখেই কি প্রমাণ করা যাবে যে চিঠিখানা কে লিখেছে ?

—না পারার কি আছে ? কোন একটা লেখা দেখে কি আপনি বলতে পারেন না, এটা আপনার মা, দাদা, বৌদি কিম্বা আপনার নিজের কিনা ? ঐ চিঠির লেখা দেখেই তো একটু আগে আপনি বলেছেন যে ওটা আপনার পিসিমার নিজের লেখা নয়।

একটু সময় চিন্তা করে সব্যসাচীর কথার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে সবিতা। তারপর বললে, হ্যাঁ, তা হয়তো পারবো। এঁদের সকলের হাতের লেখার সঙ্গেই যে আমি পরিচিত। কিন্তু একই রকম লিখতে অভ্যস্ত দু'জনের হাতের লেখা কি হতে পারে না ?

দ্বিধার সুরে সব্যসাচী বললে, বোধহয় হতে পারে।

—তা'হলে তখন কি হবে ? একই ধরনের লেখা হলে কি করে আমার পরিচিত লেখককে খুঁজে বের করবো ?

একটু হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, আমি আপনি হয়তো পারবো না। কিন্তু

যারা পারে তেমন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাদের কাজই কেবল দলিল দস্তাবেজের হাতের লেখা পরীক্ষা করা।

সব্যসাচীর কথায় সেইমুহূর্তে খানিকটা উৎসাহ বোধ করে সবিতা। সেই সঙ্গে তার কৌতূহলও বেড়ে ওঠে। এমন যে একদল মানুষ আছে যাদের কাজই কেবল হাতের লেখা পরীক্ষা করে বেড়ানো—এই খবরটাই তার কাছে নতুন।

সবিতার মনের কথা যেন টের পায় সব্যসাচী। বললে, বিশ্বাস করুন, সত্যি এমন একদল সরকারী মানুষ আছে যাদের কাজই কেবল হাতের লেখা পরীক্ষার মাধ্যমে রকমারী জাল-জালিয়াতি, চুরি-জোচ্চুরি ধরে বেড়ানো। তাদের বলা হয় হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট—হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ। এটা নাকি আধুনিক বিজ্ঞানের একটা শাখা।

—এই কলকাতায় তেমন বিশেষজ্ঞ আছে নাকি?

—আলবৎ আছে। তাদেরই একজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পর্যন্ত আছে। ঐ চিঠির ব্যাপারে যাদের ওপর আপনার সন্দেহ হয় তাদের হাতের লেখা পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই বলে দেয়া সম্ভব যে তাদের মধ্যে কেউ ঐ চিঠি লেখার জন্যে দায়ী কিনা।

এতদিনে যেন একটু আশার আলো চোখে পড়ে সবিতার। মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে সব্যসাচীর ওপর। ঘোর অন্ধকারে যখন সে কেবল চারিদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর আবির্ভাব যেন আশার আলো বহন করে এনেছিল তার কাছে। এবার হয়তো সেই পত্র লেখক বর্বর লোকটাকে সে খুঁজে বের করতে পারবে। পর্দার আড়ালে থেকে যে মানুষটা বিষাক্ত কলমের আঁচড়ে একটি নিষ্পাপ কুমারী মনকে রক্তাক্ত করে তুলবার জন্যে দায়ী তার স্বরূপ হয়তো উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হবে এবার।

সবিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে সব্যসাচী বললে, এবার বলুন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হাতের লেখা জোগাড় করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?

জবাব দেয় সবিতা, সেটা কিছু অসম্ভব কাজ নয়। বিশেষ করে আমার অফিসে যারা কাজ করে তাদের লেখা তো যে কোন সময় যোগাড় করা যাবে।

—শুধু অফিসের হলে তো চলবে না। আপনার আত্মীয়দের মধ্যে যারা সন্দেহজনক তাদের লেখাও তো জোগাড় করতে হবে। বিশেষ করে আপনার সেই পিসিমার দেওর-পো মন্টা গুহর হাতের লেখা তো অবশ্যই চাই।

চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, দেখা যাক কতদূর কি করা যায়।

—হ্যাঁ, সেগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসুন। সেই সঙ্গে ঐ চিঠিটাও আনুন। আমার তো বিশ্বাস আমরা সেই লোকটিকে ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো।

—আপনার সঙ্গে কি এখানেই আবার দেখা হবে? কথাটা জিজ্ঞেস করেই কিন্তু সবিতা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে ওঠে।

সব্যসাচী সরলভাবেই জবাব দেয়, হ্যাঁ, এখানেই। এটাই তো আমাদের মিলনক্ষেত্র। কথাটা শেষ করেই কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠে সব্যসাচী। ছি-ছি, একটি অনাত্মীয়া মহিলার কাছে কী উচ্চারণ করলো সে? তাই সে তাড়াতাড়ি ইংরেজির ব্যবহারে নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে বললে, আমাদের মিটিং প্লেস তো এটাই। তা'ছাড়া যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন তো আপনার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর নিতে আপনার অফিসেও মাঝে মধ্যে টেলিফোন করতে পারি।

মুখে কিছু না বলে চুপ করে থাকে সবিতা। সব্যসাচী সেই মৌনতাকে সম্মতি বলে ধরে নিয়ে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে।

(এগারো)

ইদানীং মাঝে মাঝেই একটা চিন্তা পেয়ে বসে সবিতাকে। সব্যসাচীর কথা মনে হলেই সেই চিন্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সব্যসাচীর মত একটি যুবক হঠাৎ এমনিভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে এলো কেন? কী তার উদ্দেশ্য? শুধুই উপকার, নাকি অন্যকিছু? ভেঙে যাওয়া সম্বন্ধ জোড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা? কিন্তু কেন? এদেশে কি মেয়ের অভাব? বিশেষ করে সব্যসাচীর মত একজন উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল যুবক তো যে কোন পাত্রীর মা-বাবার লোভের বস্তু।

অবশ্য, সব্যসাচীকে অবিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত সে পায় নি। মানুষটাকে অবিশ্বাস করতেও মন চায় না, আবার পুরোপুরি বিশ্বাস করতেও যেন কোথায় খটকা লাগে। সেই বিশ্রী চিঠিটার অসভ্য লেখককে পর্দার আড়াল থেকে টেনে বের করার কোন পথই যখন সে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন হঠাৎ এই মানুষটার আবির্ভাব কি কেবল কাকতালীয়? নাকি এর পেছনে লোকটির অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

নারীমন স্বাভাবিক কারণেই একটু সন্দেহপ্রবণ। প্রকৃতিই তাদের সন্দেহ করতে শিখিয়েছে। বিশেষকরে কুমারী মন সবকিছুকেই ভালো করে যাচাই না করে গ্রহণ করতে ভয় পায়। এই সন্দেহটুকুই তাদের রক্ষাকবচ। আবার

সন্দেহটুকু দূর হয়ে গেলেই সে হয়ে ওঠে অন্ধ। তখন যুক্তির চাইতে হৃদয়বৃত্তিই কাজ করে বেশি। সবিতাও সেই সন্দেহের দোলায় মনে মনে দুলতে থাকে।

ইদানীং সেই বিশ্রী চিঠিটা সবিতা তার নিজের ব্যাগের মধ্যেই রাখে। এটা এখন তার সর্বক্ষণের সাথী। এই চিঠিখানা যেন তার শত্রু। এখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেই এর অক্ষরগুলো যেন কদর্য হাসি হেসে বিদ্রূপ করে সবিতাকে। শত্রুকে চোখের আড়াল করতে সাহস হয় না বলেই হয়তো এটা তার সবসময়ের সঙ্গী। অফিসে কিম্বা বাড়িতে সময় পেলেই সে চিঠিটা বের করে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে। পড়ে পড়ে এটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তার। এর প্রতিটি অক্ষরের ছাঁদই এখন তার পরিচিত। চেনা-জানা লোকের লেখার সঙ্গে এর ছাঁদ সে মনে মনে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারেই সে ব্যর্থ হয়। না, এই চিঠির লেখা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বিচিত্র নারীমন। সবিতা মনে মনে ঠিক করে, এর মধ্যে সে আর সব্যসাচীকে টেনে আনবে না। সব্যসাচী তাকে যতটা সাহায্য করেছে তা-ই যথেষ্ট। সন্দেহভাজনদের হাতের লেখা জোগাড় করার পরামর্শ সে দিয়েছে, এই সহরে হাতের লেখার বিশেষজ্ঞদের খবর সে জানিয়েছে। ব্যাস, এই পর্যন্তই থাক। এর পরের বাকি কাজটুকু সে একাই করবে। সব্যসাচী যতই কেননা আগ্রহ দেখাক, সে একাই যা পারে করবে। পত্রলেখকের উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে তখন তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরে-সুস্থে এগোলেই চলবে। সবিতা বিশ্বাস করে, আজ হোক কাল হোক সেই অজানা লেখককে সে ধরে ফেলতে পারবেই। তারপরেই তার সঙ্গে হবে তার বোঝাপড়া।

মনে মনে সবিতা যতই কেন না সংকল্প করুক। কাজের বেলায় কিন্তু তার পক্ষে সব্যসাচীর নির্দেশমত না চলে উপায় থাকে না। সব্যসাচীর বলে দেওয়া পথেই সে এগোতে থাকে ধীরে ধীরে। সবিতা যদিও রিসেপসনিস্ট কিন্তু অফিসের নিয়ম অনুযায়ী অনেক ফাইল-ই যাতায়াত করে তার মাধ্যমে। অনেক অফিসের মত রাঙা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে কেবলমাত্র "হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ" বলেই তার রিসেপসনিস্টের কাজ শেষ হয় না। এর ওপর রীতিমত ফাইল-ওয়ার্কও করতে হয় তাকে।

এই সুবাদে অফিসের প্রায় প্রতিটি কর্মচারীর হাতের লেখার সঙ্গেই সবিতা পরিচিত। তাই সুযোগমত অফিসের ফাইল থেকে তাদের লেখা সংগ্রহ করতে শুরু করে সে। সংগ্রহ না বলে চুরি বলাই ভালো। হ্যাঁ, চুরিই করে সবিতা। কর্তৃপক্ষের বিনে অনুমতিতে অফিস ফাইল থেকে কাগজ সরানো চুরি ছাড়া আর কি? ধরা পড়লে তার চাকরি চলে যেতে পারে। এসব জানা সত্ত্বেও সবিতা নিয়মিত এই কাজ করে চলে। প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে বিবেকের দংশন

অনুভব করতো সবিতা। অবশেষে ধীরে ধীরে সে নিজের মনকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে এটা ঠিক চুরি নয়। এটা হচ্ছে অনুসন্ধান। তাছাড়া প্রয়োজন শেষে সে এগুলো আবার স্বস্থানেই রেখে দেবে।

অফিসের অন্যান্যদের মধ্যে সবিতার প্রধান নজর অমল বাগচী, অরুণ রায় দিব্যেন্দু সান্যাল ও রথীন চ্যাটার্জীর ওপর। ইতিমধ্যে অফিসের অনেক কর্মীর লেখা ই স্থান করে নিয়েছে সবিতার ব্যাগের মধ্যে। বাড়ি এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে চিঠির লেখার সঙ্গে সেই লেখাগুলো নিজে নিজেই মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সবিতা। লেখার ছাঁদ ও রেখার টান দেখে হয়তো সন্দেহ হয় একজনকে, পরক্ষণেই তাকে রেহাই দিয়ে সেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে অন্য একজনের ওপর। অফিস ফাইলে সব লেখাই ইংরেজিতে আর সেই চিঠিটা বাংলায়। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা লেখা মিলিয়ে দেখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে সবিতার। সবকিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। তবুও কিন্তু নিরুৎসাহ হয় না সে। গভীর মনোযোগে সে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সেই বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরগুলো। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, এদের প্রত্যেকের বাংলা লেখা যদি সে জোগাড় করতে পারতো তা' হলে হয়তো অনেক সহজ হতো তার কাজ। কিন্তু তাদের বাংলা লেখা সে জোগাড় করবে কেমন করে? অফিস ফাইল তো বাংলায় লেখা হয় না।

সব্যসাচীকে বাদ দিলেও অফিসে এসে প্রায় প্রতিদিনই সব্যসাচীর ফোনের জন্যে অপেক্ষা করে সবিতা। শোভাবাজারের নির্দিষ্ট বাস স্টপে নেমে প্রতিদিনই তার চোখজোড়া প্রথমে গিয়ে পড়ে সেই চা দোকানের ওপর। অবশেষে সেই মানুষটির জন্যে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। একটু যেন অভিমানও হয়। সবিতা না হয় তাকে বাদ দিয়েই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছে কিন্তু এ খবর তো সব্যসাচীর জানার কথা নয়। তা'হলে সে কেন একবার টেলিফোন পর্যন্ত করতে পারে না? আসলে, আশ্বাস দিতে পুরুষের জুড়ি নেই। মিথ্যে আশ্বাস ও স্তোক দেওয়াই বোধহয় ওদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

অবশেষে একদিন এলো সেই প্রতীক্ষিত টেলিফোন। উত্তেজনায় বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে সবিতার। অনুযোগের ভাষা বেরিয়ে আসতে চায় তার মুখ থেকে।

সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, হাতের লেখা জোগাড় করতে পেরেছেন?

সেই মুহূর্তে একটা কড়া জবাব দিতে ইচ্ছে হয় সবিতার। বলতে ইচ্ছে হয়— হ্যাঁ, জোগাড় করেছি। তবে তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। যা পারি আমি নিজেই করবো।'

কিন্তু কেন যেন শেষ পর্যন্ত সেই কড়া জবাব বের হয় না তার মুখ থেকে। তার বদলে শান্ত সুরে সে বললে, হ্যাঁ, জোগাড় করেছি।

সবিতা আশা করেছিল সব্যসাচী হয়তো শোভাবাজারের সেই চা-দোকানে তার সঙ্গে দেখা করে কাজপত্রগুলো নিতে চাইবে, আর সেই সুযোগে সে ঘুরিয়ে দু'কথা শুনিয়েও দেবে তাকে। কিন্তু তার বদলে সব্যসাচী যখন বললে যে কাজের চাপে আজকাল প্রায়ই তাকে দেরি করে অফিস থেকে বেরোতে হচ্ছে এবং তারপক্ষে নাকি শোভাবাজার যাওয়া সম্ভব নয় তখন আশাহত সুরে সবিতা জিজ্ঞেস করে, তা'হলে এগুলো কেমন করে আপনার কাছে পাঠানো যাবে ?

—তাই তো, টেলিফোনের অপর প্রান্তে জেগে ওঠে সব্যসাচীর চিন্তিত কণ্ঠস্বর, আমি নিজে যে সময় করে একবার আপনাদের অফিসে যাবো তা-ও সম্ভব নয়। আপনাদের ছোট সাহেব অর্থাৎ সজলদা টের পেলে লজ্জায় পড়তে হবে।

টেলিফোনে কান লাগিয়ে স্থির হয়ে থাকে সবিতা। ভয়ানক রাগ হয় তার সেই মুহূর্তে। ইস্, আর কেউ যেন অফিস করে না ! এমন কি চাকরি যে একটা দিন একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোনো চলে না ? ভাবতে ভাবতে রাগটুকু জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে তার কাজল কালো চোখ দু'টোকে সজল করে তোলে। একবার ভাবে, বলে দেয় যে আপনার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যা পারি আমিই করবো। এই সহরে হাতের লেখা বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করে তাঁদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার ভার আপনার না নিলেও চলবে।

কিন্তু ঐ ভাবনা পর্যন্তই। একটি কথাও সে টেলিফোনের মাউথপীসের সামনে উচ্চারণ করতে পারে না। সেই কালো যন্ত্রটি কানে লাগিয়ে সে কেবল স্থির হয়ে থাকে।

সব্যসাচী আবার বলে ওঠে, ঠিক্ আছে, আমি আমার অফিসের একজন বেয়ারাকে পাঠাচ্ছি। ওর হাতেই কাগজপত্রগুলো দিয়ে দেবেন, কেমন ? সেই সঙ্গে ঐ চিঠিটা পাঠাতেও ভুলবেন না।

এবার মৃদু কণ্ঠে সবিতা বললে, এমন দরকারী কাগজপত্র একজন সাধারণ বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠানো একটু রিস্কি হবে না ?

—না—না, কোন চিন্তা নেই আপনার। আমি যাকে পাঠাচ্ছি সে বেয়ারা হলেও খুব দায়িত্বশীল। আমি বরঞ্চ তার হাতে আপনার নামে একটা চিঠি দিয়ে দেব, কেমন ?

—আচ্ছা। শব্দটি উচ্চারণ করেই টেলিফোন ছেড়ে দেয় সবিতা। মনে মনে ভাবে, বেশ তো, দেখা যাক্ না ওর সেই পরিচিত হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ কতদূর কি করতে পারে। লেখককে যদি চিহ্নিত করা যায় তা'হলে তার পরের

কাজগুলো না হয় সে একাই করবে। তার মধ্যে সে কিছুতেই ঐ মানুষটাকে টেনে আনবে না।

বিকেলের দিকে বেয়ারার পোশাক পরা একজন বয়স্ক লোক এসে হাজির হয় সবিতার কাছে। সঙ্গে সব্যসাচীর একখানা চিঠি।

চিঠিখানা হাতে নিতে গিয়ে বুকটা যেন কেমন করে ওঠে সবিতার। সব্যসাচীর চিঠি এই প্রথম সে হাত পেতে নিচ্ছে। হোক গিয়ে মামুলি সাধারণ চিঠি, তবুও চিঠি তো বটে।

সব্যসাচীদের অফিসের প্যাডে হাতে লেখা চিঠি। শুরুতে কোন রকম সম্বোধন করে নি সব্যসাচী। ইংরেজিতে লেখা স্পষ্ট হস্তাক্ষর। কাগজপত্রগুলো পত্রবাহকের হাতে তুলে দিতে কেবল অনুরোধ জানানো হয়েছে সবিতাকে। শুরুতে সম্বোধন না থাকলেও নীচের এক কোণে সবিতার নাম ও ঠিকানা।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে লোকটিকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজের চেয়ারে এসে বসে সবিতা। সুন্দর হাতের লেখা মানুষটির। গ্রাফোলজি অর্থাৎ হাতের লেখা দিয়ে মানুষের চরিত্র বিচারের প্রচলন ইউরোপ-আমেরিকাতে থাকলেও এদেশে নেই। তবে হাতের লেখা যদি চরিত্রের আয়না হয় তা'হলে বলা যেতে পারে এই চিঠির লেখকের মনটিও তার এই লেখার মত সুন্দর। কোন মালিন্য নেই এতে।

কিন্তু সব্যসাচী বাংলায় না লিখে ইংরেজিতে লিখতে গেল কেন? কথাটা মনে হতেই সবিতার সুন্দর ভ্রূ ধনু খানিকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জবাবটাও এসে পড়ে তার মনে। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার সব্যসাচী বোধহয় বাংলায় তেমন সরগড় নয় কিম্বা ওর বাংলা লেখা বোধহয় ভালো নয়। যাকগে, সবিতার কাছে ইংরেজি বাংলা দু'টোই সমান।

সব্যসাচীর চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে সেই দরকারী কাগজপত্র গুছোতে যাবে, হঠাৎ কি মনে হতেই সবিতা সব্যসাচীর চিঠিটা আবার তুলে নেয় নিজের হাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! সবিতা দ্রুত হাতে ব্যাগ থেকে টেনে তোলে আগেকার সেই চিঠিখানা। তারপর দু'টো চিঠি পাশাপাশি রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠি দু'টো দেখছে সবিতা। একটা বাংলায়, অন্যটা ইংরেজিতে। যতই দেখছে ততই একটা ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে তার মনে। অক্ষরগুলো ভিন্ন হলেও দু'টোর মধ্যে কেমন যেন এক আশ্চর্য মিল। তবে কি এই বিশ্রী চিঠিটার লেখক সব্যসাচী নিজে? কথাটা মনে হতেই মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে সবিতার। মানুষটার মন এত নীচু? কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে নিজের বাবার কাছে এই জঘন্য চিঠিটা লিখে বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেছে? এই বিয়েতে যদি তার মত না থাকতো তা'হলে সেকথা নিজের মা-

বাবাকে স্পষ্ট করে না বলে একটি নির্দোষ মেয়ের ঘাড়ে মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা চাপালো কেন? তবে কি সে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবে বলেই এই পথ বেছে নিয়েছিল? বেশ তো, তাই যদি হবে তা'হলে সব্যসাচী সবিতাকে সাহায্য করার নাম করে হঠাৎ একদিন তার সামনে এসে হাজির হলো কেন? বিয়ে যখন ভেঙেই গেল, তখন তার এই হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ কি?

যতই ভাবতে থাকে ততই যেন মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সবিতার। ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলে আবোল-তাবোল চিন্তা করতে থাকে। ভয়ানক এক রহস্য তার সামনে। এর সমাধান করে দেবে কে?

এখন কি করবে সবিতা? বাইরে বসে থাকা ঐ বেয়ারাকে সে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে? কিন্তু তাতে তার কী লাভ? এই মুহূর্তে খোদ সব্যসাচীকে সে সন্দেহ করছে। তার এই সন্দেহ হয়তো সত্য কিম্বা হয়তো অমূলক। এই পরিস্থিতিতে সেই বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অন্য লেখাগুলো পরীক্ষা না করিয়ে তার লাভ কি? তার চাইতে তারা সবাই যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তখন না হয় সবিতা সব্যসাচীর দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই মনটা খুশি হয়ে ওঠে সবিতার। এই মুহূর্তে অফিসের কর্মচারীদের লেখার সঙ্গে সব্যসাচীর এই লেখাটাও বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু সব্যসাচী যদি টের পায়? না, সে যাতে টের না পায় তেমনি একটা ব্যবস্থাই করতে হবে।

অফিসের মোট বাইশ জন কর্মচারীর লেখা রয়েছে তার কাছে। তাদের প্রত্যেকের কাগজের ওপরেই এক-দুই করে বাইশটি সংখ্যা সে লিখে রেখেছিল আগেই। তা'ছাড়া একখানি কাগজে ঐ বাইশজন লোকের নামের লিস্টও করে রেখেছিল আলাদাভাবে।

সবিতা এবার সব্যসাচীর চিঠিখানা নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার এককোণে তেইশ সংখ্যাটি লিখে দেয়। কিন্তু নামের লিস্টে সব্যসাচীর নামটা লিখতে গিয়েই সে থেমে যায়। না, আসল নামটা লেখা চলবে না। সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক যখন সব্যসাচীর পরিচিত তখন আসল নাম দেখে তার সন্দেহ হতে পারে। তার চাইতে অন্য কোন নাম লেখাই ভালো। কি নাম লিখবে? মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডবের নাম সব্যসাচী। তা'হলে পাণ্ডব বসু লিখলে কেমন হয়? কিন্তু 'পাণ্ডব' কি কারুর নাম হতে পারে? তার চেয়ে অর্জুন নামটাই ভালো। হ্যাঁ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

অবশেষে নামের লিস্টে তেইশ নম্বর ব্যক্তির নাম লেখা হয় 'অর্জুন বসু'। যেন অর্জুন বসুও এই অফিসের একজন কর্মী।

কাগজপত্র সমেত সীলকরা খামটা সেই বেয়ারার হাতে দিয়ে সবিতা মিষ্টি সুরে

বললে, এটা আপনার সাহেবের হাতে দিয়ে বলবেন যে এটা খোলার কোন প্রয়োজন নেই। এই অবস্থায় যেন এটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে লোকটি বেরিয়ে যায়। এক প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে নিজের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সবিতার এক সময় মনে হয় যে তার সেই কৌতূহলের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে খানিকটা বেদনার খাদ।

(বারো)

যতই দিন যায় ততই যেন অস্থিরতা বাড়তে থাকে সবিতার। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্ষতবিক্ষত। ক্লান্ত সৈনিকের মত অফিসে নিজের কাজটুকু কেবল সে করে যায়। সেই আগের উৎসাহ উদ্দীপনা যেন আর নেই। এতদিন যেটা ছিল কেবল বেদনা-মিশ্রিত কৌতূহল ইদানীং তার মধ্যে যেন খানিকটা ভয়ের আমদানী ঘটেছে। সব্যসাচী কিছু টের পেয়েছে নাকি? হয়তো পেয়েছে। তাই বোধহয় সে পনেরো কুড়িদিনের মধ্যেও একবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না।

বেশ তো, নাই বা যোগাযোগ করুক, সবিতার তাতে কিছু যায়-আসবে না। মনের কৌতূহল মনেই চেপে সে অপেক্ষা করবে। আজ হোক, কাল হোক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফল সে জানতে পারবেই। কিন্তু তাতে যদি প্রমাণিত হয় যে স্বয়ং সব্যসাচীই দায়ি, তখন কি হবে? কি যে হবে তা' এই মুহূর্তে বলতে পারে না সবিতা। সেক্ষেত্রে সে তাকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করতে পারে, তার মা-বাবার কাছে পুত্রের গুণপনার কথা প্রকাশ করে দিতে পারে, এমনকি ইচ্ছে করলে সে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করতে পারে। কিন্তু সব্যসাচীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কি সে তৃপ্ত হবে? অপরাধীর শাস্তি হয়েছে বলে কি সে বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করবে?

এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে সত্যিই ভয় পায় সবিতা। বিবেকের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না। একদিকে সে যখন আশা করছে যে বিশেষজ্ঞ সবিতার সন্দেহকেই সমর্থন করে রায় দেবেন যে ঐ চিঠির লেখক সব্যসাচী অর্থাৎ অর্জুন বোস তখন অন্যদিকে তার একান্ত কামনা যে ঐ অর্জুন বোস যেন নির্দোষ প্রমাণিত হয়। এই মানসিক দোটানার মধ্যে পড়েই ক্লান্ত হয়ে ওঠে সবিতা। মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে এ থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। আর সেই মুক্তির

একমাত্র পথ সেই বিশেষজ্ঞের অভিমত জানতে পারা। কিন্তু কেমন করে সে তা' জানতে পারবে? সব্যসাচীর কাছ থেকে তো কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কবে তার এই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে?

সবিতাকে কিন্তু আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। পরের দিনই টেলিফোন এলো সব্যসাচীর। কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেই সবিতা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কি বললেন আপনার বিশেষজ্ঞ বন্ধু?

—না—না, আমার বন্ধু নন তিনি। পরিচিত মাত্র।

—কি বললেন তিনি?

দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত শক্তি যেন সেই মুহূর্তে সবিতার কানের কাছে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এখনই হয়তো সে শুনতে পাবে একটি নাম— অর্জুন বোস। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই শুনতে পেল না সবিতা। সব্যসাচী কেবল বললে, কিছুই বলেন নি।

—কিছুই বলেন নি? কথাটার পুনরাবৃত্তি করে সবিতা।

—না কিছুই বলেন নি। বলা সম্ভব নয় বলেই বলেন নি।

—সম্ভব নয় কেন?

জবাব আসে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে, তিনি বললেন যে কাজল শব্দটির মধ্যে জল শব্দটি আছে বলে কাজল ও জলের মধ্যে নাকি তুলনা চলে না।

—তার মানে?

—মানে অতি সরল। ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের তুলনা করা চলে না। স্ক্রিপ্ট্ ভিন্ন হলে বিশেষজ্ঞরা নাকি অসহায়।

সব্যসাচীর কথায় হতাশ কণ্ঠে সবিতা বললে, তা'হলে উপায়?

—তাই তো ভাবছি, জবাব দেয় সব্যসাচী, ঠিক্ আছে, আজ একবার অফিস ফেরৎ আপনাদের ঐ চা-দোকানে যাচ্ছি। ওখানে বসেই যা হোক একটা কিছু ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে। সেই সঙ্গে আপনার ঐ কাগজপত্রগুলোও ফেরত নেবেন।

চায়ের দোকানের সেই নির্দিষ্ট টেবিলের সামনেই আবার মুখোমুখি বসে দু'জনে। বিশেষজ্ঞের মন্তব্য সবিতার মনের চিন্তাধারায় কোন হেরফের ঘটায়নি। কাজেই তার এখনকার দুশ্চিন্তা কেবল অর্জুন বোসকে নিয়ে। কথাবার্তায় তো মনে হয় না সব্যসাচী কিছু টের পেয়েছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, আপনার অফিসের কর্মীরা কি জানতো যে আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছিল?

—হ্যাঁ, জানতো, জবাব দেয় সবিতা, ছুটির জন্যে যখন দরখাস্ত করি তখনই তারা টের পেয়েছিল।

—বিয়ে যে কেন ভেঙে গেল তাও কি তারা জানতে পেরেছিল ? ঐ চিঠির কথা কি আপনি কাউকে বলেছেন ?

মাথা নেড়ে সবিতা জবাব দেয়, না, ঐ তারিখে কেন আমার বিয়ে হলো না তা বোধহয় কেউই বুঝতে পারেনি।

—এ নিয়ে কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ?

—না। তবে আমি টের পেয়েছি যে এ নিয়ে অফিসের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে।

—আচ্ছা, আপনার পিসিমা কিম্বা তাঁর দেওর-পো কবে টের পেয়েছিল যে এরকম একটা বিশ্রী চিঠির জন্যে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে ?

—তা আমি বলতে পারবো না।

—এ নিয়ে তাঁর সেই দেওর-পোর সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল আপনার ?

জবাব দিতে গিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে সবিতা। মাথা নীচু করে চায়ের কাপের দিকে চোখ রেখে সে বললে, না, তার সঙ্গে কোনদিন কোন কথাই হয়নি আমার।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সব্যসাচী আবার বললে, ঐ চিঠির লেখককে যদি আপনার খুঁজে বের করতে হয় তাহলে এবার আপনাকে আর একটা কঠিন কাজ করতে হবে।

—বলুন, কি কাজ ?

—যাদের ইংরেজি লেখা আপনি যোগাড় করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই বাংলা লেখা জোগাড় করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় সবিতা, অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। তাদের বাংলা লেখা তো অফিস ফাইলে পাওয়া যাবে না।

—তাদের দিয়ে বাংলা লেখাতে হবে।

একটু সময় চুপ করে থেকে সবিতা আবার বললে, প্রথম কথা, কি বলে আমি তাদের বাংলা লিখতে অনুরোধ করবো ? দ্বিতীয়তঃ, আমি বললেই তারা আমার কথা শুনবে কেন ? বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ যদি বাস্তবিকই ঐ চিঠির লেখক হয়ে থাকে তা হলে সে বাংলা লিখতে কিছুতেই রাজি হবে না।

—তা' বটে। কথাটা বলেই আবার কিছুক্ষণ চায়ের খালি কাপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সব্যসাচী। সবিতা কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। নিজের ভাবনা-চিন্তা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হওয়ার যে কি আনন্দ তা' বোধহয় সে টের পায় সেই মুহূর্তে। সমস্যা সমাধানের পন্থা খুঁজে চলেছে সব্যসাচী, আর সবিতা কেবল সেই খোঁজার ফলাফলের আশায় নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

সহসা সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, এই ব্যাপারে আপনি কি আপনার অফিসের এমন

কারুর ওপর নির্ভর করতে পারেন না যে নাকি আপনাকে খানিকটা সাহায্য করতে পারে ?

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় সবিতা, কই, তেমন কোন লোক তো দেখছি না।

—আচ্ছা, আপনাদের ছোটসাহেব অর্থাৎ আমাদের সজলদা আপনাকে একটু হেল্প্ করতে পারেন না এই ব্যাপারে ?

—ওরে বাবা, ভীত কণ্ঠে বলে ওঠে সবিতা, মিত্তির সাহেবের মত গম্ভীর আর কড়া মেজাজের মানুষের কাছে তো এসব ব্যাপার নিয়ে এ্যাপ্রোচ্ করাই মুসকিল।

একটু হেসে সব্যসাচী বললে, আপনারা সজলদাকে চিনতে পারেন নি বলেই এমনি কথা বলছেন। আমি ও'কে অনেকদিন ধরেই জানি। কড়া মেজাজের মানুষ হলেও আপনি যদি সঠিক এ্যাপ্রোচ্ করতে পারেন ত'হলে উনি নির্ঘাৎ হেল্প করবেন আপনাকে। একবার চেষ্টা করে দেখুন না। উনি যখন আপনাদের অফিস এ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের প্রধান তখন উনি ইচ্ছে করলে যে কোন উপায়ে অফিস কর্মচারীদের বাংলা লেখা জোগাড় করতে পারবেন।

—তা হয়তো পারবেন, কিন্তু——। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে কথাটা শেষ করে সবিতা।

—এর মধ্যে আর কিন্তু টানবেন না। প্রয়োজন যখন আপনার তখন চেষ্টাও আপনাকেই করতে হবে।

বিব্রত কণ্ঠে সবিতা এবার বললে, এ ব্যাপারে ছোট সাহেবের সাহায্য চাইতে হলে তো সেই বিশ্রী চিঠিটার কথা সাহেবের কাছে প্রকাশ করতে হয়।

—তাই করবেন। কিছু পেতে হলে কিছু দিতেই হয়।

কথাটা শেষ করেই সব্যসাচী নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর আবার বললে, এক্সকিউজ মী, আজ আর বেশিক্ষণ বসতে পারছি না। বাড়িতে একটু বিশেষ কাজ আছে।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভাবে আবার বলে ওঠে, এই দেখুন, কাগজপত্রের খামটাই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। বলতে বলতে নিজের এ্যাটাচি কেস্ খুলে সেই খাম বের করে সবিতার হাতে দিয়ে বললে, ভালো করে মিলিয়ে দেখুন। অফিসের কাগজ, হারিয়ে গেলে বিপদে পড়বেন।

—না—না, হারাবে কেন ? একটা ঢোক গিলে কথাটা বলতে বলতে সবিতা তাড়াতাড়ি খামটা পুরে ফেলে নিজের ব্যাগের মধ্যে। তার ভয়, পাছে সব্যসাচী কাগজপত্রের মধ্যে তার নিজের সেই চিঠিটা দেখে ফেলে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সব্যসাচী। সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও। সব্যসাচী নিজের হিপ্-পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে চায়ের দাম মিটিয়ে দিতে গিয়েই কি ভেবে যেন থেমে যায়। তারপর মৃদু হেসে সবিতার দিকে তাকিয়ে মৃদু

হেসে বললে, সেদিনের চায়ের দাম আমি দিয়েছিলাম, আজ দেবেন আপনি। আমাদের কারুর আর কোন অনুযোগ থাকবে না, কি বলেন ? একেবারে ফিফ্‌টি—ফিফ্‌টি।

সবিতা কোন জবাব না দিয়ে একটু স্নিগ্ধ হেসে এগিয়ে যায় কাউন্টারের দিকে। সেই মুহূর্তে সে নিশ্চিন্ত হয় যে সব্যসাচী অর্জুন বোসের কথা কিছুই টের পায়নি। এখন কেবল এটুকুই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

ফুটপাথে এসে সব্যসাচী বিদায় নিতে গিয়ে হেসে সবিতাকে বললে, আশা করছি ওয়াট্‌সন তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। লেখাগুলো জোগাড় হয়ে গেলেই দয়া করে আমাকে একবার টেলিফোনে জানাবেন। এখানে এসে এবার আমি নিজে আপনার কাছ থেকে লেখাগুলো নিয়ে যাবো।

সবিতা চুপ্ করে থেকে কেবল শুনে যায় সব্যসাচীর কথা। সব্যসাচী আবার বললে, হ্যাঁ, আর একটা কথা। এবার কিন্তু আপনার পিসিমার সেই দেওর-পো মণ্টা গুহর বাংলা লেখাও চাই। আপনার পিসিমাকে আপনি বাদ দিতে চাইছেন দিন, কিন্তু ঐ লোকটির লেখা অবশ্যই চাই।

—কিন্তু তা' তো সম্ভব নয়, বিব্রত সুরে বলতে থাকে সবিতা, যার সঙ্গে জীবনে আমি কখনও কথাই বলিনি তার লেখা আমি জোগাড় করবো কেমন করে ?

মুচকি হেসে সব্যসাচী বললে, জবাবটা কিন্তু শার্লক হোম্‌সের সুযোগ্য সহকারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়াটসনের মতো হলো না।

এবার সবিতাও হেসে জবাব দেয়, ওয়াট্‌সন না হয় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, কিন্তু শার্লক হোমস্ নিজে তো কেবল উপদেশ দিয়েই খালাস। এর বেশি আর কি করছেন তিনি ?

—কিছু না—কিছু না, মাথা নেড়ে বলে ওঠে সব্যসাচী, কেবল ঐ উপদেশ দেওয়া ছাড়া একালের শার্লক হোম্‌সের আর অন্য কোন ক্ষমতাই নেই। উপদেশ দেওয়া সহজ বলেই এযুগের শার্লক হোম্‌সের এই ভূমিকা দেখছেন। তাই এবার এগিয়ে আসতে হবে ওয়াট্‌সনকে।

কথাটা শেষ করেই হেসে ওঠে সব্যসাচী। তারপর সেদিনের মত বিদায় নিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যায়। দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরে সবিতা।

(তের)

দিন কয়েক ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলে সবিতা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সহজ পথের হদিশ করতে পারলে না। অবশেষে সে ঠিক্ করলে সব্যসাচীর উপদেশই তাকে গ্রহণ করতে হবে। সোজাসুজি ছোট সাহেবকে গিয়ে ধরে পড়তে হবে। একমাত্র তিনিই পারেন এমন কোন ব্যবস্থা করে দিতে যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—অফিসের কর্মীদের বাংলা লেখাও জোগাড় হবে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য টের পাবে না তারা।

কিন্তু ধরে পড়তে হবে বললেই তো আর ধরা যায় না। ছোট সাহেব বলে কথা! একবার 'না' বললে 'হ্যাঁ' করানো কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভব। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা গোটা ব্যাপারটাই তা'হলে খুলে বলতে হবে তাঁকে। লজ্জায় মরে গেলেও বলতে হবে। ব্যাক-গ্রাউণ্ড কিছু না বলে সবিতা তো আর হুট্ করে সাহেবকে বলতে পারে না যে, আপনি দয়া করে অফিসের কর্মচারীদের বাংলা লেখা জোগাড় করে দিন। আর ব্যাক্-গ্রাউণ্ড বলা মানেই তো ঐ বিশ্রী চিঠিটা সম্পর্কে সব কিছু খুলে বলা। চাই কি সাহেব হয়তো ঐ চিঠিটা চাক্ষুষ দেখতে চাইতেও পারেন।

ভাবতে ভাবতে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সবিতা। তার চারিত্রিক অপবাদে পূর্ণ ঐ চিঠিটা সম্পর্কে নিজের মুখে বলতে হবে সাহেবকে। তাতেও যে তার কার্যসিদ্ধি ঘটবেই তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। সব কিছু শুনে তিনি হয়তো বলতে পারেন, সবই তো বুঝলাম মিস্ ঘোস, কিন্তু ওদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কেমন করে আমি ওদের বাংলা লেখা জোগাড় করতে পারি? সেক্ষেত্রে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে ব্যাপারটা সাহেব জানতে পেরে মনে মনে হয়তো হাসবেন।

ভাবনা-চিন্তায় মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সবিতার। সব্যসাচী তাকে কি বিপদেই না ফেললে। সেই মুহূর্তে সবিতার মনের ভাবখানা যেন এই যে সব্যসাচী নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই যেন সবিতাকে এমন একটা দুরূহ কাজের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

অবশেষে সবিতা ছোট সাহেবকে ব্যাপারটা বলতেই মনে মনে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ প্রস্তুতি পর্যন্তই। বলা আর হয়ে ওঠে না। আজ কাল করে দিন পিছোতে থাকে।

সেদিন কেন যেন মনের মধ্যে একটা ভয়ানক জেদ চাপলো সবিতার। না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। আজ টিফিনের পরে সাহেবের ঘরে ফাইল নিয়ে যখন যাবে তখনই ব্যাপারটা বলবে তাঁকে।

ফাইল নিয়ে সবিতা এসে দাঁড়ায় ছোট সাহেবের ঘরে। সজল মিত্র তখন আর একটা ফাইলে খস্ খস্ করে কি যেন লিখছিলেন। মাথা তুলে তিনি একবার তাকান সবিতার দিকে। পরক্ষণেই নিজের স্বাভাবিক নিরাসক্ত ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এক মিনিট বসুন।

সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে সবিতা চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে, আর ছোট সাহেব আপন মনে নিজের কাজ করতে থাকেন।

হঠাৎ কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ হতেই সবিতা দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সাহেবের দিকে তাকিয়েই বিস্মিত হয়ে ওঠে। সাহেব একদৃষ্টে গম্ভীর মুখে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

চোখাচোখি হতেই ছোটসাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, আই সাপোজ ইউ আর আন-ওয়েল, মিস ঘোষ। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম আপনার চোখে-মুখে যেন দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এনিথিং হ্যাপেন্ড?

মেঘ না চাইতেই জল। নিজের বলার কথাগুলো সাহেবের সামনে কেমন করে শুরু করবে—এই কথাই যখন সে বসে বসে ভাবছিল তখনই সাহেব নিজেই তার একটা সুন্দর সুযোগ এনে দিলেন।

এমন সুযোগ বারে বারে আসবে না। কোন কারণে সাহেব বোধহয় আজ বেশ ভালো মুডে আছেন। সবিতা সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ গ্রহণ করে বললে, ইয়েস স্যার, একটা ব্যাপারে দিন কয়েক ধরে আমি রিয়েলি ওরিড্।

অফিস কর্মীদের এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় নেই ছোটসাহেবের। কিন্তু সেদিন কেন যেন তিনি ফাইলের জন্যে হাত না বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকেন সবিতার বক্তব্য শোনার জন্যে। আর সবিতাও সংক্ষেপে সেই চিঠিটার কথা ও বিয়ে ভেঙে দেবার ব্যাপারটা বর্ণনা করে সাহেবের কাছে।

শুনতে শুনতে ছোটসাহেবের গম্ভীর মুখখানা আরও একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। সবিতা থামতেই তিনি তেমনি স্বরে জিজ্ঞেস করেন, নাউ হোয়াট? কী করতে চান আপনি?

জবাব দেয় সবিতা, আমি সেই পত্রলেখককে খুঁজে বের করতে চাই। আর তার জন্যে চাই আপনার সহযোগিতা ও সাহায্য।

—বাট আই কাণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, বলতে থাকেন সজল মিত্র, আমি বুঝতে পারছি না এ ধরনের প্রাইভেট ব্যাপারে আমি কেমন করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—হ্যাঁ স্যার, ইচ্ছে করলে আপনি পারেন, বলতে থাকে সবিতা, সেই উড়ো চিঠির লেখক চিঠিটা লিখেছিল বাংলায়। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ অভিমত দিয়েছেন যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাংলা লেখার সাহায্যে তিনি তাকে ধরে দিতে পারবেন।

একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠেন ছোট সাহেব, বেশ তো, কিন্তু আমি তার কি করতে পারি ?

জবাব দেয় সবিতা, সন্দেহভাজনদের মধ্যে এই অফিসে যাঁরা আছেন তাঁদের বাংলা লেখা জোগাড় করে দিতে হবে আপনাকে। আপনার কাছে এটুকুই আমার অনুরোধ।

—হোয়াট্ ! চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন সজল মিত্র। পরক্ষণেই নিজেকে খানিকটা সংযত করে বললেন. এই অফিসের কেউ যদি এ কাজ করে থাকে তা'হলে সেটাকে অফিস-এ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের ওপর একটা স্লার্ বলেই মনে করবো। সেক্ষেত্রে আই শ্যাল্ স্যাক্ হিম—তাকে বরখাস্ত করবো আমি।

সবিতা চুপ্ করে থাকে। ছোটসাহেব আবার বললেন, ধরে নিলাম আপনার অনুমানই সত্য। এখনকার কেউ-ই সেই চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু এতে তার লাভ ? আপনার নামে বদনাম ছড়িয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়ে তার কি লাভ হলো ?

মাথা নীচু করে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, তা' তো ঠিক বলতে পারছি না।

—আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও তো কেউ এ কাজ করতে পারে ?

—হ্যাঁ পারে, তবে আমার ধারণা এখানকার কেউ-ই করেছে।

—এই ধারণার পেছনে কোন বিশেষ কারণ আছে কি ?

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, না, তেমন কোন বিশেষ কারণ নেই। তবে—

কথাটা শেষ না করেই সবিতা থেমে যায়। অফিসের যুবকদের মধ্যে অনেকের নজরই যে তার দিকে ছিল এবং তার স্পষ্ট উপেক্ষা যে তাদের রাগের কারণ হতে পারে একথা সে নিজের মুখে কেমন করে বলবে এই ছোটসাহেবকে ? তা'ছাড়া, মেয়েদের যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে আর সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা যে পুরুষের চাইতে বেশ খানিকটা বেশি নির্ভুল অনুমান করতে পারে সে কথাই বা সবিতা এই ছোট সাহেবকে বোঝাবে কেমন করে ?

সবিতার মনের কথা অনুমান করেই সম্ভবতঃ সজল মিত্র ঐ সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না। কেবল বললেন, আপনার কথায় তো মনে হচ্ছে চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও পাত্রপক্ষ বিয়ে ভেঙে দেয় নি, দিয়েছেন আপনারা। তা, বিয়ে যখন ভেঙেই গেছে তখন সেই চিঠির লেখককে খুঁজে বের করে আপনার কি লাভ হবে ?

—তা' জানি না, একটু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, আমি কেবল জানতে

চাই সেই কাপুরুষটা কে যে নাকি একটা নির্দোষ মেয়ের কাঁধে এমন অপবাদের বোঝা চাপিয়েছে।

সজল মিত্র আর কিছু না বলে একটু সময় চুপ করে থাকেন। হাতের মোটা সেক্রেটারিয়েট পেন্সিল দিয়ে নিজের গালে মৃদু আঘাত করতে করতে কি যেন ভাবতে থাকেন তিনি। তারপর একসময় পেন্সিলটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট, মিস্ ঘোষ। অফিস কর্মচারীদের বাংলা লেখা কেমন করে জোগাড় করা যাবে তা' নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে হবে। এমন একটা লজ্জার ব্যাপার যাতে অফিসে জানাজানি না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

সবিতা চুপ করে কেবল তাকিয়ে থাকে ছোট সাহেবের দিকে। সাহেবের ভাব-ভঙ্গি বেশ আশাপ্রদ। হয়তো তিনি তাকে সাহায্য করবেন। সজল মিত্রর ওপর মনটা কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সবিতার।

হঠাৎ ছোটসাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, অল্ রাইট, মিস্ ঘোষ। বিষয়টা একবার ভেবে দেখি আমি। সময়মত আপনাকে জানাবো।

কৃতজ্ঞ সবিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সতর্ক সজল মিত্র বলে ওঠেন, হাতের ফাইলগুলো রেখে যাবেন না ?

—আই এ্যাম্ সরি, স্যার, ঘুরে দাঁড়িয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলে ওঠে সবিতা। তারপর ফাইলগুলো সাহেবের টেবিলের ওপর রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

নিজের ঘরে ফিরে এসে অনেকটা হাল্কা বোধ করে সবিতা। এখন সে অনেক নিশ্চিন্ত। একমাত্র দুশ্চিন্তা এখন পিসিমার দেওরপো সেই মন্টা গুহকে নিয়ে। তার লেখা সে জোগাড় করবে কেমন করে ?

পরের দিনই আবার ছোটসাহেবের ঘরে ডাক পড়ে সবিতার। সবিতা এসে দাঁড়াতেই সজল মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, অফিসের ক'জনকে আপনার সন্দেহ হয় ?

জবাব দেয় সবিতা, বাইশজনকে।

—কে—কে ?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে জবাবের জন্যে কিন্তু অপেক্ষা করেন না সজল মিত্র। তাড়াতাড়ি আবার বললেন, না—না, কেবলমাত্র ঐ বাইশজনের বাংলা লেখা জোগাড় করার চেষ্টা করলে অফিসশুদ্ধ সকলেরই সন্দেহ হবে। তার চাইতে অফিসের প্রত্যেকটি কর্মীকে দিয়েই বাংলা লেখাতে হবে।

এরপরে দু'তিন দিন সজল মিত্রর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কোন কথাই হয় না সবিতার। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, অফিস ফাইল নিয়ে আলোচনাও হয় কিন্তু ঐ

ব্যাপারটা ছোটসাহেব যেন ভুলেই গেছেন। সবিতাও সাহেবের মেজাজ বুঝে এ নিয়ে আর কিছু বলে না।

অবশেষে একদিন এক অদ্ভুত হুকুম আসে ছোটসাহেবের কাছ থেকে। অফিস অর্ডার—কর্মচারীদের প্রতি সাহেবের নির্দেশ। এমন অদ্ভুত নির্দেশের কথা এর আগে কেবলমাত্র এই অফিসে কেন, কোন অফিসেই বোধহয় কেউ শোনে নি।

কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের জন্যে প্রত্যেককেই দরখাস্ত করতে হয় ডাইরেক্টর বোর্ডের কাছে। এই অফিসে এটাই বিধি। ছোট সাহেব সজল মিত্র নির্দেশ দিলেন, যেহেতু রাজ্য সরকার সরকারী কাজে বাংলা ভাষা চালু করার জন্যে উদগ্রীব, সেই হেতু তাদের অফিসেও এবার সবাইকে বাংলায় দরখাস্ত করতে হবে। অবশ্য অবাঙ্গালী কর্মীদের জন্যে ইংরেজিই চালু থাকবে।

সাহেবের এই অদ্ভুত নির্দেশকে প্রায় সকলেই গ্রহণ করে হাল্কা ভাবে। কেউ বলে, সরকারী বেসরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বোধহয় সত্যিই চালু হলো। কেউ বা এই নির্দেশকে ছোট সাহেবের উর্বর মস্তিষ্কের একটা খেয়াল বলেই ধরে নেয়। তবে বিনা দ্বিধায় সময়মত দরখাস্ত পেশ করে সকলেই। ছোট সাহেবের এই বিচিত্র নির্দেশের আসল অর্থ একমাত্র বুঝতে পারে সবিতা। মনে মনে সাহেবের বুদ্ধির তারিফ করে সে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো সজল মিত্রর। সবিতাকে নিজের ঘরে ডেকে মৃদু হেসে তিনি বললেন, এসটাব্লিশমেন্ট সেকশনকে নির্দেশ দিয়েছি এই দরখাস্তের ভিত্তিতে ইনক্রিমেন্টের কাগজপত্র তৈরী করে দরখাস্ত সমেত আমার কাছে পেশ করতে। কাগজপত্র চলে যাবে ডাইরেক্টর বোর্ডের কাছে, আর দরখাস্তগুলো পাবেন আপনি। আশাকরি এতে আপনার কাজ হবে। দিনকয়েক অপেক্ষা করুন। ওগুলো আমার কাছে প্লেস্ হলেই আপনি পাবেন।

সবিতার মনে হলো, সে বোধহয় এই প্রথম ছোট সাহেবের মুখে হাসি দেখলো। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো তার। সাহেব সহায় আছেন বলেই এটা সম্ভব হলো। সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে।

একটা কঠিন কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার আনন্দে নিজের ঘরে এসেই সব্যসাচীকে টেলিফোন করলে সবিতা। অপর প্রান্তে সব্যসাচীর কণ্ঠস্বর জেগে উঠতেই সবিতা বললে, বাংলা লেখা জোগাড় হয়েছে।

—তাই নাকি? কেমন করে হলো? সব্যসাচীর কণ্ঠে কৌতূহল।

—সেকথা টেলিফোনে বলা যাবে না।

—ঠিক্ আছে, পরে শুনবো। ওগুলো কবে আনছেন?

—দিন কয়েক দেরি হবে।

—বেশ তো, বেটার লেট্ দ্যান নেভার। হেসে বললে সব্যসাচী, তা, সেই বাইশ জনের প্রত্যেকের বাংলা লেখাই তো পাওয়া গেছে ?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আরও চল্লিশ জনের পাওয়া গেছে।

— তার মানে আপনাদের অফিসের সবার, কেমন ?

— হ্যাঁ, কেবল আমি নিজে ছাড়া।

সব্যসাচী আবার হেসে উঠে বললে, আপনি আর তবে বাদ থাকছেন কেন ? নিজের লেখাও ঐ সঙ্গে ঢুকিয়ে দিন না।

—কেন, আমাকেও কি সন্দেহ করেন নাকি ?

—শার্লক হোম্‌সের কাছে কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

—ওয়াটসনও নয় ?

একটু থেমে সব্যসাচী আবার হেসে বললে, এবার কিন্তু সত্যিই মুশকিলে ফেললেন। শার্লক হোম্‌স ওয়াট্‌সনকে সন্দেহ করতেন কিনা সেটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে, রহস্য সিরিজের বইতে খোদ গোয়েন্দাকেও যে সময় সময় অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে তার প্রমাণ আছে।

—বেশ তো, এই যদি আপনার ইচ্ছে তাহলে না হয় নিজের লেখাও ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

সব্যসাচী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বেশ একটু জোরেই হেসে ওঠে। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বললে, আপনার সেই পিসিমার দেওর পোর লেখা জোগাড় করেছেন তো ?

—এখনও করতে পারি নি।

—না—না, ওটা কিন্তু অবশ্যই চাই।

—ওটার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন, বলুন তো ?

—বোধহয় এককালে আমার রাইভ্যাল ছিল বলে। সব্যসাচীর কথায় সবিতা মনে মনে কৌতুক বোধ করে আবার বললে, বেশ, চেষ্টা করছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে নিজের সীটে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে সবিতা। তার নিজের লেখা নিয়ে সব্যসাচী যে ঠাট্টাটুকু করলে তার তাৎপর্য সঠিক ভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। এটা কি শুধুই ঠাট্টা, নাকি সেই অর্জুন বোসের বদলা ? কে জানে, সেই অর্জুন বোসের ব্যাপারটা টের পেয়েই হয়তো সব্যসাচী এই ঠাট্টাটুকু করলে তার সঙ্গে।

সে যাক গে, অর্জুন বোসের ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও তার চলবে। এখন প্রধান সমস্যা পিসিমার সেই দেওর পো মন্টা গুহ।

এই মন্টাকে সে আগে দু'একবার দেখেছে, কিন্তু কথা বলে নি কখনও।

বলার প্রয়োজনও হয়নি। অবশ্য, কাতুপিসি যে কখনও সে চেষ্টা করেন নি তা নয়। আগে যখন তিনি প্রায়ই সবিতাদের বাড়ি আসতেন তখন মণ্টার গুণপনার কথাই তিনি সাতকাহন করে বিবৃত করতেন। বিশেষ করে সবিতা কাছে থাকলে তিনি মণ্টাকে প্রায় স্বর্গের দেবতাদের পর্যায়ে ঠেলে তুলতেন। অনেক অনুরোধের পরে নিভাননী একবার সবিতাকে নিয়ে গিয়েওছিলেন ননদের বাড়িতে। সেখানে কাত্যায়নী সবিতার সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করলেন যেন সবিতা একরকম তাঁর গৃহবধূ হয়েই গেছে, কেবল মন্ত্রটুকু পড়াই যা বাকি। ঘরভর্তি লোকের মধ্যে পিসির সেই ব্যবহারে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। রাগ হয়েছিল কাতুপিসির ওপর, তার চাইতেও বেশি নিজের মায়ের ওপর। এখানে আসার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না তার। পিসি দুঃখ পাবে বলে নিভাননীই একরকম জোর করে তাকে নিয়ে এসেছিলেন।

ফিরে আসার একটু আগে কাতুপিসি হঠাৎ বলেছিলেন, হ্যাঁরে সবু, তুই তো ফুলের বাগান ভালোবাসিস। তা, আমাদের ছাদের ওপরের বাগানটা একবার দেখে আয় না। মণ্টার নিজের হাতে তৈরি বাগান।

বাগানের কথা শুনে ছাদে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল সবিতার, কিন্তু মণ্টার কথা শুনে কেমন যেন নিরুৎসাহ বোধ করেছিল। অবশেষে কাতুপিসি আর একবার বলতেই মনের দ্বিধাটুকু কাটিয়ে বাড়ির আর একটি মেয়ের সঙ্গে উঠে গিয়েছিল ছাদে।

বাগানটি সত্যিই সুন্দর। ছাদ জুড়ে কেবল ফুলের টব, আর তাতে নানারকম ফুলের সমারোহ। নয়-দশ বছরের ফ্রকপরা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই ফুলের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালই লাগছিল সবিতার। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় সে জিজ্ঞেস করে, তোমার মণ্টাদা নিজের হাতে বাগানের কাজকর্ম করে?

সবিতার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপর হঠাৎ মুখ বেঁকিয়ে বললে, কি বললে? মণ্টাদা এসব করেছে? তাহলেই হয়েছে আর কি!

বিস্মিত কণ্ঠে সবিতা আবার বললে, কেন, কাতুপিসি তো তাই বললেন।

—বড় জেঠির কথা ছাড়ুন, বলতে থাকে মেয়েটি, এসব মেজ জেঠার কাজ। বুড়ো হয়েছেন তবুও তিনি রাত দিন কেবল এর পেছনেই পরিশ্রম করেন। মণ্টাদা তো ভুলেও একবার ছাদে আসে না।

সবিতা আর কিছু না বলে কেবল ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতে থাকে। সবিতার কাছে দেওর পোর মূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে গিয়ে কাতুপিসির এই মিথ্যে প্রচেষ্টায় মনে মনে হাসে।

হঠাৎ ছাদের সিঁড়ির কাছে জেগে ওঠে মণ্টার কণ্ঠস্বর। ফ্রকপরা মেয়েটিকে ডেকে সে বললে, এই যে বুড়ি, তোকে নীচে এক্ষুনি ডাকছে।

বুড়ি একবার মুখ তুলে তাকায় সবিতার দিকে। সবিতার মুখের বিরত ভঙ্গিটুকু দেখে তার ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি ফুটে ওঠে। এই মুহূর্তে তাকে নীচে পাঠানোর অর্থ বোঝার মত বয়স তার হয়েছে। কাজেই আর অপেক্ষা না করে 'আমি যাই' বলে একছুটে সে নীচে চলে যায়।

সবিতা যখন সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত তখন হঠাৎ মণ্টা দু'পা এগিয়ে এসে হেসে বললে, আমার এই বাগান কেমন দেখছ ?

কথাটা কানে যেতেই ভয়ানক রাগ হয় সবিতার। একে তো ব্যাপারটাই মিথ্যে, এই বাগান মণ্টার নয়। তারওপর মণ্টার সঙ্গে তার এমন পরিচয় নেই যে প্রথম সম্বোধনেই সে তাকে 'তুমি' বলতে পারে।

সবিতাকে নিরুত্তর দেখে মণ্টা তার আরও একটু কাছে সরে আসে। তারপর পাশের গোলাপ গাছ থেকে পটাপট কয়েকটা গোলাপফুল ছিঁড়ে সবিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তেমনি হেসে হেসে আবার বললে, গোটা কলকাতায় বিখ্যাত আমার এই বাগানের গোলাপ। নাও, এ'কটা ধরো।

এই অবস্থায় না নিলে অভদ্রতা হয় তাই সবিতা হাত পেতে নেয় ফুল ক'টা। তারপর গায়ের আঁচলটা আর একটু টেনে দিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে আসে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে সবিতা তার মা নিভাননীকে বেশ কড়া করে দু'কথা শুনিয়েছিল। শান্তস্বভাবের নিভাননী মেয়ের উষ্মার সঠিক কারণটি ধরতে না পারলেও কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করে চুপ করে রইলেন। কেবল বাসন্তী গম্ভীর সুরে শাশুড়িকে বলেছিলেন, না—মা, এবার থেকে সবুকে নিয়ে আর ঐ বাড়ি যাবেন না।

সেই চিঠির ব্যাপারে মণ্টা গুহকে সন্দেহ করার মত যথেষ্ট কারণ আছে সবিতার। তাই সব্যসাচীর পরামর্শমত মণ্টার হাতের লেখা যোগাড় করার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। অনেক ভেবে-চিন্তেও কোন উপায় খুঁজে পায় না। মণ্টার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ থাকলে হয়তো একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেত। আর একজন হচ্ছেন স্বয়ং তার কাতুপিসি যাঁর সাহায্য পেলে ব্যাপারটা হয়তো অনেক সহজ হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কাতুপিসির সাহায্য চাইতে যাওয়া কেবল নিষ্ফলই নয়, বিপদজনকও বটে।

এমনি পরিস্থিতিতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো সবিতার। বিষয়টি মনে হতেই সবিতা প্রথমটায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে লজ্জায়। ছি—ছি, এমন একটা কাজ

সে করবে কেমন করে? ব্যাপারটা জানাজানি হলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও অন্য কোন পথের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে সে এই পথে এগোতেই সংকল্প করলে।

চিঠি লিখলে সে মণ্টাকে। না, প্রেমপত্র নয়, তবে তার প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। ছোট্ট চিঠি—মাত্র কয়েকটি লাইন। চিঠির প্রথমে কোন সম্বোধন নেই। সবিতা চিঠিতে মণ্টাকে জানালে যে বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে নাকি তার ভালই হয়েছে। ঐ ব্যাপারে সে মণ্টার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চায়। কখন, কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে জানতে পারলে সে খুশি হবে। পত্রপাঠ মণ্টা যেন তার জবাব দেয়। চিঠিটা ডাকে দিয়ে সবিতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে জবাবের জন্যে। সে নিশ্চিৎ যে মণ্টা এই চিঠির জবাব দিতে একটুও দেরি করবে না।

সত্যিই তাই। দিন তিনেকের মধ্যেই এলো সেই জবাব। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই মণ্টা লিখলে তার চিঠিতে যার সারমর্ম এই যে সবিতাকে নাকি সে অনেকদিন থেকেই নিজের হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছে। এতকাল সে নাকি কেবল সবিতার এই আহ্বানটুকুর অপেক্ষাতেই বসেছিল। অবশেষে সেই আহ্বান পেয়ে সে নাকি ধন্য। মধ্য কলকাতার একটা বিখ্যাত সিনেমার নাম করে সে জানিয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যায় সেখানেই সে অপেক্ষা করবে তার জন্যে।

চিঠিটা হাতে পেয়ে আনন্দ ও ভয়ের একটা মিশ্র অনুভূতিতে সবিতার মন ভরে ওঠে। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মণ্টার বাংলা লেখা এসেছে তার হাতে। তবে এই লেখা জোগাড় করতে গিয়ে সে একটা বিপদও ডেকে এনেছে। এর পরে মণ্টা যদি নাছোড়বান্দা হয়ে তার পেছনে ঘুরতে শুরু করে তা'হলে তার বলার কী থাকবে? এমনি একটা পরিণতির আশংকায় মনটা সেইমুহূর্তে দুলে উঠলেও নিজেকে সংযত করে সবিতা। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক্। আপাততঃ হাতের লেখা পরীক্ষার ব্যবস্থা হোক্।

শোভাবাজারের সেই চায়ের দোকানে আবার দু'জনে হাজির। সব্যসাচীর বোধহয় এবারেও ইচ্ছে ছিল অফিসের বেয়ারাকে পাঠিয়ে সে সবিতার কাছ থেকে কাগজপত্রগুলো আনিয়ে নেয়। কিন্তু টেলিফোনে সবিতার কণ্ঠস্বরে বেয়ারাকে পাঠাতে ঠিক্ ভরসা হয় নি তার। তাই সে তাড়াতাড়ি কথাটাকে ঘুরিয়ে বলে উঠেছিল, না—না, আমি নিজেই আজ ওগুলো আপনার কাছ থেকে বুঝে নেব। আপনি আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করবেন। অফিসে কতগুলো জরুরী কাজ আছে, তাই যেতে আমার হয়তো একটু দেরি হতে পারে। তবে আমি যাবো অবশ্যই।

"একটু" কথাটির অর্থ যে পাকা দেড় ঘণ্টা তা ঠিক বুঝতে পারে নি সবিতা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল সব্যসাচীর জন্যে। রাস্তায় পথচারীর ভিড়। যেতে যেতে কেউ কেউ আবার কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছিল সবিতার দিকে। তাদের ঐ দৃষ্টির সামনে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল সবিতা। ব্যাপারটা বাস্তবিকই অস্বস্তিকর। কেবল অস্বস্তিকরই নয়, বিরক্তকরও বটে। একজনের জন্যে এভাবে রাস্তার মাঝখানে হা-করে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই অর্থহীন। তবে সেই মুহূর্তে সেই অর্থহীন কাজটা করা ছাড়া আর কোন উপায় তার ছিল না। গরজ তার নিজের, সব্যসাচীর নয়। সবিতা বোধহয় সেইদিনই প্রথম টের পেলে যে কারুর জন্যে এমনিভাবে অপেক্ষা করার মত বিরক্তিকর কাজ সংসারে বোধহয় খুব বেশি নেই।

সব্যসাচীর যতই দেরি হচ্ছিল সবিতার বিরক্তির মাত্রা ততই বাড়ছিল। আর বিরক্তি যতই বাড়ছিল ঐ দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটির ওপর ততই খাপ্পা হয়ে উঠছিল সে। অবশেষে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে দেহে প্রচণ্ড ক্লান্তি ও মনে প্রচণ্ডতম বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে মনে মনে যখন সে প্রস্তুত হচ্ছিল, ঠিক তখনই তার সামনে আবির্ভাব ঘটে সব্যসাচীর। অপরাধীর সুরে সে বলে ওঠে, এক্সট্রিমলি সরি আপনাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে। কি করবো, চেষ্টা করেও আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলাম না।

সবিতা মুখে কিছু না বলে কেবল একবার তাকায় সব্যসাচীর দিকে। তার সেই দৃষ্টির মধ্যে সেইমুহূর্তে যে ভাবটুকু ফুটে উঠেছিল তাকে নির্ভেজাল বিরক্তি না বলে অভিমানের সামান্য খাদ মিশ্রিত বলাই বোধহয় সঙ্গত। সেই দিকে নজর পড়তেই এক বিচিত্র আনন্দে মনটা ভরে ওঠে সব্যসাচীর। কিন্তু সেই পরিবেশে মনের সেই আনন্দটুকু প্রকাশ করতে ঠিক সাহস হয় না। কি জানি, ধরা পড়ে গিয়ে সবিতা যদি হঠাৎ অন্য কিছু বলে বসে? তার চাইতে মনের আনন্দ মনেই চেপে রাখা ভালো। তাতে প্রকাশের বাড়তি তৃপ্তিটুকু না পেলেও হারাবার ভয় থাকে না।

সব্যসাচী অপলক চোখে একটু সময় তাকিয়ে থাকে সবিতার দিকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আর একবার ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। এবার চলুন।

চা-দোকানের দিকে যেতে যেতে সবিতা অনুভব করে সব্যসাচী মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে তার মুখের দিকে। সবিতার মনের সেই উত্তেজনা এখন অনেকটাই প্রশমিত। তাই সে সব্যসাচীর কথার রেশ ধরে বললে, সংসারে এমন একদল লোক আছে যারা নাকি অপরাধ করতেও যতটা পারদর্শী চট্‌পট্ ক্ষমা চেয়ে অপরাধ স্খালনেও ঠিক ততটাই পটু। তারা সর্বদাই ভাবে, ক্ষমা চাইলেই বুঝি ক্ষমা

পাওয়া যায়। ক্ষমা পেয়ে পেয়েই তাদের এই দশা। তাদের উচিত ক্ষমা না করা।

—বেশ তো, অপরাধ যখন করেছি তখন মাথা পেতে শাস্তি নিতেও আমি প্রস্তুত। হালকা সুরে সব্যসাচী জবাব দেয়।

—কিন্তু সাধারণ শাস্তিতে এধরনের লোকের সংশোধন হয় না। কৃত্রিম গম্ভীর সুরে সবিতা বললে।

—বেশ তো, অসাধারণ শাস্তিই না হয় নেবো।

কথা বলতে বলতে সব্যসাচী ও সবিতা এসে ঢোকে সেই চা-দোকানে। কোণের দিকে দু'টো চেয়ার দখল করে দু'জনে বসতেই সব্যসাচী আবার বললে, কৈ, বললেন না তো, কি ধরনের অসাধারণ শাস্তি আমার প্রাপ্য?

—ভাবছি। চাপা হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে সবিতা বললে।

—হ্যাঁ, আপনি ভাবুন, আর আমি চায়ের অর্ডার দিই।

—তা দিন, তবে শুধু চা নয়, সেই সঙ্গে ওমলেটের কথাও বলে দিন।

মেঘ না চাইতেই জল! সবিতার আজ হলো কি? নিজের মুখে সে আজ ওমলেট খেতে চাইছে।

দোকানের বয়কে ডেকে সব্যসাচী চায়ের সঙ্গে ডবল ডিমের দু'টো ওমলেটের কথা বলতেই সবিতা তাড়াতাড়ি বললে, উহুঁ, ডবল ডিমের নয়, সিঙ্গল ডিমের হলেই চলবে।

দোকানের ছোকরাটি চলে যেতেই সব্যসাচী আবার বললে, ভাবনা-চিন্তা করে সেই অসাধারণ শাস্তি সম্পর্কে কিছু ঠিক করলেন কি?

—হ্যাঁ, করেছি, মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

কৌতূহলী সব্যসাচী বললে, বেশ, বলুন তা' হলে।

সবিতা সব্যসাচীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, আজ খোদ শার্লক হোমসকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে ওয়াটসনের কাছ থেকে। ওয়াটসন তাঁকে এই শাস্তিই দিচ্ছে যে আজ যে কাগজপত্রগুলো শার্লক হোমস ওয়াটসনের কাছ থেকে পাবেন, সেগুলো সম্পর্কে সাত দিনের মধ্যেই হোমসকে বিশেষজ্ঞের অভিমত এনে দিতে হবে। একটি দিন দেরি করলেও চলবে না।

—সর্বনাশ! বলে ওঠে সব্যসাচী, আমার পরিচিত সেই হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক তো এখন কলকাতায় নেই। দিন চারেক পরে ফিরবেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁর অভিমত—

সব্যসাচী কথাটা শেষ করার আগেই বলে ওঠে সবিতা, কোন ওজর-আপত্তি শুনতে চায় না ওয়াটসন। শোনা যায় হোমসের অসাধ্য নাকি কিছু নেই।

চিন্তিত মুখে বলতে থাকে সব্যসাচী, তাই তো, কি বিপদেই যে ফেললেন!

এখন তো দেখছি ভদ্রলোক ফিরে এলেই তাঁকে শক্ত করে ধরে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

—হ্যাঁ, তাই করবেন।

—বেশ, চেষ্টা করবো।

—না, চেষ্টা নয়। এটা চাই-ই। এই তো শাস্তি। যেমন করেই পাবেন আগামী সপ্তাহের এই দিনে এখানে এই সময় আবার আমাদের দেখা হবে। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের অভিমত তখন যেন অবশ্যই জানতে পারি। ওয়াট্‌সনের কাজ ওয়াট্‌সন করেছে, এবার শার্লক হোম্‌সের কাজ হোম্‌স করুন।

—তথাস্তু। বলেই সব্যসাচী চা-দোকানের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে একটু জোরেই বলে ওঠে, চা আনতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

সব্যসাচীর চড়া কণ্ঠস্বর কাউণ্টারের কাছে বসা ম্যানেজারের হিসাবের গোলমাল হয়ে যায়। বিরক্ত কণ্ঠে সে সব্যসাচীর কথাটাকেই ভেতরে রিলে করে দেয়, চা আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

দোকানের অন্দরমহল থেকে ভেসে আসে সেই ছোক্‌রার কণ্ঠস্বর, এই যে আনছি।

গরম ওমলেটে কামড় দিয়ে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে সবিতাকে, ক'জনের লেখা জোগাড় হলো?

—বাষট্টি জনের।

—আপনার পিসিমার সেই দেওরপো'র লেখা পেয়েছেন?

একটু ইতঃস্তত করে জবাব দেয় সবিতা, হ্যাঁ, তাকে নিয়ে তেষট্টি।

কৌতূহলী কণ্ঠে সব্যসাচী আবার জিজ্ঞেস করে, কেমন করে সেই মণ্টা গুহর লেখা জোগাড় করলেন?

মণ্টা গুহর প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির আশংকাই এতক্ষণ করছিল সবিতা। সহসা তার মুখে কোন জবাব জোগায় না।

সবিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে সব্যসাচীর কৌতূহল আরও বেড়ে ওঠে। কিন্তু তা দমন করে সে আবার বললে, না—না, আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না। জোগাড় করাটাই আসল। কেমন করে জোগাড় করলেন তা' আমার না জানলেও চলবে। যা হোক্‌ একটা কিছু অনুমান করে নেবো।

সর্বনাশ! লোকটি বলে কি? মণ্টা গুহ সম্পর্কে কী অনুমান করে বসবে সব্যসাচী? তার চাইতে সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই বোধহয় ভালো। তবুও দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বললে, আমি না বললে আপনি কী অনুমান করবেন?

জলের মত সহজভাবে জবাব দেয় সব্যসাচী, যা হোক্‌ একটা কিছু।

এই ধরুন, মণ্টা গুহর কোন গানের কিম্বা কবিতার খাতা আপনি জোগাড় করেছেন।

—না, বলতে থাকে সবিতা, সে গানও গায় না, কবিতাও লেখে না। ওসব দিকে তার নজর নেই। তার একমাত্র নজর কেবল পয়সার দিকে।

—না—না, এমন কথা বলবেন না। পয়সা ছাড়া আরও একটা দিকে তার নজর আছে। তা হচ্ছে আপনি নিজে।

সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে সবিতা। তারপর একটু দৃঢ় কণ্ঠে বললে, সেসব কিছু নয়। তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম আমি। সে তার জবাব দিয়েছে।

—কি লিখেছিলেন চিঠিতে? তার হাতের লেখা পরীক্ষার কথা নাকি? কথাটা বলেই মৃদু হাসে সব্যসাচী।

সবিতা কোন জবাব না দিয়ে হাতের চামচ ওমলেটের ওপর ফেলে রেখে নিজের ব্যাগটা টেনে নেয় কাছে। তারপর ব্যাগ থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে সব্যসাচীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, নিন্, পড়ে দেখুন।

কৌতূহল দমন করে সব্যসাচী বললে, আমার পড়ার প্রয়োজন কি? আপনার প্রাইভেট চিঠি আমি পড়বো কেন?

--আমি বলছি, পড়ুন। তা'ছাড়া এই চিঠি যখন অপরিচিত সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে দেখাতে আপত্তি নেই তখন আপনাকে দেখাতে আপত্তি থাকবে কেন?

—ডাক্তারের কাছে যা বলা যায় তা' কি অন্যের কাছে বলা চলে?

—হ্যাঁ চলে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে চলে। আপনি পড়ুন।

আর আপত্তি করে না সব্যসাচী। চিঠির ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সহসা সে বলে ওঠে, এ আপনি কী করেছেন? এবার ঐ মণ্টা গুহকে সামলাবেন কেমন করে?

দুশ্চিন্তা এমন একটা বস্তু যা নাকি ভয়ানক সংক্রামক। এই প্রশ্নটা সবিতার মনেও এসেছিল এর আগে কিন্তু এ নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায়নি সে। কিন্তু সব্যসাচীর কণ্ঠে তার আভাস পাওয়া মাত্রই সেটা একটা প্রকাণ্ড বোঝার মত তার মাথার ওপর চেপে বসে। ভীত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, আমিও তো তাই ভাবছি। কি করি বলুন তো? এ ছাড়া তার হাতের লেখা জোগাড় করার আর কোন পথ তো খোলা ছিল না।

—তা' হয়তো ঠিক, বলতে থাকে সব্যসাচী, তবে আপনি একটু বেশি এগিয়েছেন। যাক্ গে, যা হবার হবে। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। ঐ সিনেমার সামনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুন।

—বলছেন কি আপনি ? তাতে তো বিপদ আরও বাড়বে।

—দেখা না করলেও কি বিপদ কমবে বলে মনে করছেন ?

সবিতা আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। সেই মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে, এর জন্যে একমাত্র এই সব্যসাচীই দায়ী। সে অমন করে জোর না দিলে মণ্টা গুহর চিঠির জন্যে সবিতা হয়তো এ পথে যেতো না। শার্লক হোম্‌স, না হাতি! কোথায় আছে যে হোম্‌স এমনি ভাবে ওয়াটসনকে কখনও বিপদে ফেলেছে ?

সবিতাকে চুপ্‌ করে থাকতে দেখে সব্যসাচী আবার বললে, আমার মনে হয় নির্দিষ্ট দিনে আপনার উচিত মণ্টা গুহর সঙ্গে দেখা করা। সোজাসুজি না হোক আকার ইঙ্গিতে অন্ততঃ তার সম্পর্কে আপনার মনোভাব প্রকাশ করা। তাতে হয়তো সে রাগ করবে, হয়তো আপনাকে দু'চারটা কড়া কথা শোনাবে, কিন্তু তাতে ভবিষ্যতে জল ঘোলা হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ থাকবে না।

ভীত কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, আমি একা যাবো তার কাছে ?

—তাতে কি ? সে তো আর বাঘ-ভালুক নয়। তা'ছাড়া কাকেই বা আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন ? অবশ্যি যদি আপনার তেমন কেউ থাকে তো সঙ্গে নিতে পারেন।

—না, তেমন কেউ নেই।

—তা'হলে একাই যান। ভয় কি ? তা'ছাড়া, দূরের হলেও সে তো আপনার আত্মীয়।

একটু সময় চুপ্‌ করে থেকে সবিতা হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে আপনিই বরঞ্চ চলুন না আমার সঙ্গে।

—সর্বনাশ! আমি যাবো আপনার সঙ্গে ? বলে ওঠে সব্যসাচী, তারপর একটা ডুয়েল শুরু হলে সামলাবে কে ? আপনি একাই যান। কোন ভয় নেই। মনে রাখবেন, আমি আপনার সঙ্গে না গেলেও ওয়াটসনের দিকে সর্বদাই নজর থাকবে শার্লক হোম্‌সের।

সব্যসাচীর কথায় সবিতা যেন একটু আশ্বস্ত হয়। তারপর বললে, তা'হলে কাগজপত্রগুলো এবার নিন। এগুলো আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হই।

—হ্যাঁ, দিন, জবাব দেয় সব্যসাচী, আপনাদের দায়মুক্ত হওয়ার অর্থই তো হলো আমাদের দায়বদ্ধ হওয়া।

একবচনের বদলে সব্যসাচীর মুখে বহুবচনের এই ব্যবহার যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটা বিশেষ দিক নির্দেশ করে সেকথা মনে হতেই লজ্জায় মুখখানা

সামান্য লাল হয়ে ওঠে সবিতার। মাথা নীচু করে সে এক বাণ্ডিল কাগজ ও সেই ইনল্যাণ্ড লেটারখানা এগিয়ে দেয় সব্যসাচীর দিকে।

কাগজের সেই বাণ্ডিলের মধ্যে মণ্টা গুহর চিঠিখানা গুঁজতে গুঁজতে সব্যসাচী বলতে থাকে, তা'হলে মোট তেষট্টি জনের হাতের লেখা রয়েছে এর মধ্যে, কেমন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

—প্রত্যেকটা কাগজে এক-দুই করে নম্বর দিয়েছেন তো ?

এবারেও সবিতা সায় দেয় মাথা নেড়ে।

—তেষট্টি নম্বরে তো মণ্টা গুহ, তাই না ?

—হ্যাঁ। জবাব দেয় সবিতা।

সহসা একটা কাণ্ড করে বসে সব্যসাচী। নিজের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে সেই বাণ্ডিলের মধ্যে রাখতে রাখতে বললে, এই চৌষট্টি নম্বরটি হচ্ছে আর একজনের লেখা।

—আর একজন ? কে সে ? সুন্দর ভ্রু-যুগল কুঁচকে ওঠে সবিতার।

মৃদু হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, আমি জানি একেও আপনি সন্দেহ করেন।

—আমি সন্দেহ করি ? কি নাম এর ?

চাপা হাসি হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, হ্যাঁ, সন্দেহ করেন বলেই তো সেবার এর ইংরেজি হাতের লেখার কাগজে তেইশ নম্বরটি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞের কাছে। এর নাম অর্জুন বসু।

সব্যসাচীর কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবিতা যেন আচমকা আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লে। তাড়াতাড়ি নিজেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় কিছু বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে শেষপর্যন্ত কিছুই না বলে মাথা নীচু করে অপরাধীর ভঙ্গিতে কেবল চুপ করে রইলে। ছি—ছি, এ লজ্জা সে রাখবে কোথায় ? সব্যসাচীর কাছে সে যে এমনিভাবে ধরা পড়ে যাবে তা সে ধারণাই করতে পারে নি। লোকটি বাস্তবিকই ধুরন্ধর। টের পাওয়া সত্ত্বেও এতদিন সে এ নিয়ে একটি কথাও বলে নি। আর, সবিতা কিনা মনে মনে ধরে নিয়েছিল যে সব্যসাচী ব্যাপারটা টেরই পায় নি।

সবিতার লজ্জা-রাঙা মুখের দিকে অপলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সব্যসাচী। তারপর গোটা ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার প্রচেষ্টায় বলে ওঠে, ওকি, লজ্জা পেলেন নাকি ? আরে, এতে এত লজ্জা পাবার কী আছে ? বাজিয়ে নেবেন বৈকি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও তো সেই কথাই বলেছেন। যার ওপর ভরসা করতে হবে তাকে ভালোভাবে বাজিয়ে নেওয়াই তো উচিত।

সব্যসাচী ব্যাপারটাকে যতই হালকা করতে চেষ্টা করুক, সেই মুহূর্তে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হয় সবিতার। তার ওপর ধরা পড়ার লজ্জা তো আছেই।

সবিতার ভাব-ভঙ্গি দেখে সব্যসাচী একটু হেসে আবার বলতে থাকে, ব্যাপারটাকে আপনি এত সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছেন কেন, বলুন তো? আমার সেই ইংরেজি চিঠিখানাও আপনি পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, এই তো? এতে এত লজ্জার কি আছে? আমাকে সন্দেহ করে আপনি তো সাত্যিকারের একজন গোয়েন্দার মতই কাজ করেছেন। এই দেখুন না, আমারও তো সন্দেহ যে এই চিঠির লেখক আপনি নিজেও হতে পারেন। কাজেই আপনার লেখাও পরীক্ষার জন্যে পাঠানো উচিত।

সবিতা স্পষ্ট বুঝতে পারে এটা সব্যসাচীর মনের কথা নয়। সবিতার লজ্জাকে আড়াল করতে গিয়েই সে এসব কথা বলছে। কৃতজ্ঞতায় তার মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে সব্যসাচীর ওপর।

এতক্ষণে মাথা তোলে সবিতা। আরক্ত মুখে সব্যসাচীর দিকে একপলক তাকিয়েই সে সরিয়ে নেয় নিজের চোখজোড়া। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

সবিতার কথায় সব্যসাচী একটু জোরেই হেসে ওঠে এবার। হাসতে হাসতে বললে, এসব বলে আপনি এড়িয়ে যেতে চান নাকি। তা' হবে না। আপনাকেও বাংলা লেখা লিখতে হবে, আর সেই লেখা পাঠাতেও হবে বিশেষজ্ঞের কাছে। ছাড়া পাবেন না আপনি। আপনার লেখার নম্বর হবে পঁয়ষট্টি।

কথাটা বলেই সব্যসাচী নিজের পকেট থেকে একখানি সাদা কাগজ বের করে সবিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বললে, নিন লিখুন।

লোকটির ওপর কৃতজ্ঞতার মাত্রা আরও বেড়ে ওঠে সবিতার। সবিতা সম্পর্কে তার সন্দেহ যে কত জোরালো তা' প্রমাণ করে সে সবিতার সন্দেহকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করতে চায়। উদ্দেশ্য সেই একটাই—সবিতার লজ্জাকে লাঘব করে তোলা।

টানা চোখ জোড়ায় কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে সবিতার। সেই দৃষ্টিতে সে একবার তাকায় সব্যসাচীর দিকে। তারপর ব্যাগ থেকে কলম বের করে লিখতে গিয়েই থমকে যায় সে। কি লিখবে? সত্যিকারের মনের কথা বলতে গেলে তো লিখতে হয়—আপনি মহৎ। কেবল মহৎই নন, আপনি বাস্তবিকই অসাধারণ। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু, এ কথা তো লেখা চলে না। সহসা ছেলেবেলায় পড়া একটা কবিতার দুটো লাইন তার মনে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই লাইন দুটো সে লিখে ফেলে সেই কাগজে—"দেখ হে কুঠার করে চন্দন ছেদন, চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।"

(চৌদ্দ)

প্রয়োজন যেখানে বেশি প্রতীক্ষা সেখানে যেন শেষ হতেই চায় না। প্রয়োজনই বটে। সেই পত্রলেখককে যবনিকার অন্তরাল থেকে টেনে বের করে তার মুখোস খুলে দেওয়াটাই সবিতার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সে রাত দিন কেবল ঐ চিন্তাতেই মশগুল।

সবিতা নিঃসন্দেহ যে এবার সেই মুখোসধারীর মুখোস খসে পড়বেই। এতগুলো লোকের মধ্যে সেই লোকটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। বিশেষজ্ঞ তাকে এবার খুঁজে বের করবেই।

একটি সপ্তাহ যেন পুরো একটি বছর। শেষ হতে চায় না কিছুতেই। সব্যসাচী তাকে কথা দিয়েছে একটি সপ্তাহের মধ্যে সে সেই বিশেষজ্ঞের অভিমত এনে দেবে। কিন্তু তার আগেও তো সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক তাঁর অভিমত জানাতে পারেন সব্যসাচীকে। সেই আশায় আশান্বিত হয়ে ইদানীং প্রায় প্রতিদিনই সে টেলিফোন করে তাকে। কিন্তু প্রতিদিনই সেই একই জবাব আসে সব্যসাচীর কাছ থেকে—না, এখনও তিনি তাঁর অভিমত দিতে পারেন নি। আরও একটু দেরি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সবিতা এখন সব্যসাচীর কাছে অনেক সহজ। সেই প্রথম দিনের জড়তা এই ক'টা দিনের মেলামেশা কথাবার্তায় কোথায় যেন উবে গেছে। এমনকি সব্যসাচীর যে সাহায্য প্রথমটায় সবিতাকে তার ওপর করে তুলেছিল কৃতজ্ঞ সেই কৃতজ্ঞতা কোন্ মুহূর্তে যে দাবীতে রূপান্তরিত হয়েছে তা' সে নিজেও টের পায় নি। আসলে একজন বিশেষ ব্যাক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মানসিক প্রস্তুতির মধ্যে যে দাবীর বীজ লুকিয়ে থাকে, নারীমনের সেই বীজ ধ্বংস করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। সাময়িক বাধা বিঘ্ন কেবল সেই বীজের জীবনীশক্তিকেই বাড়িয়ে তোলে। অনুকূল পরিবেশে সেই বীজ অতি সহজেই মেলে দেয় তার ডালপালা। সবিতার নারীমন সেই অনুকূল পরিবেশের প্রতিশ্রুতিই সেদিন পেয়েছিল সব্যসাচীর কাছ থেকে। তার সন্দেহাকুল মনের গতি প্রকৃতিকে সমর্থন করার প্রচেষ্টায় নিজের মনটাকে সন্দেহাকুল বলে প্রতিপন্ন করতেও সেদিন পিছিয়ে যায় নি সব্যসাচী। তার এই প্রচেষ্টাই সেদিন সবিতার কাছে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস হয়ে দেখা দিয়ে তার দেহ মন জুড়িয়ে দিয়েছিল।

অবশেষে একদিন সবিতার ডাক এলো সব্যসাচীর কাছ থেকে। উত্তেজিত সবিতা টেলিফোন তুলেই জিজ্ঞেস করে, বিশেষজ্ঞের অভিমত পেয়েছেন?

অপর প্রান্ত থেকে জবাব দেয় সব্যসাচী, হ্যাঁ পেয়েছি। তবে, সেই অসাধারণ শাস্তি লাভের সুযোগ আর ঘটলো না আমার। আপনার কথামত সাতদিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞের অভিমত এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছি বলে হয়তো আমার পাওনা সেই শাস্তি এবার ডবল হবে।

সবিতা আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না। সেই পত্রলেখকের নামটা জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আপনার পাওনা শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত রইলো। এখন বলুন, বিশেষজ্ঞ কি বললেন? ঐ চিঠির জন্যে কাকে দায়ী করলেন তিনি?

জবাবে সব্যসাচী সামান্য হেসে বললে, না, এ কথা টেলিফোনে না বলে মুখে বলাই ভালো। আজ একবার আসুন সেই চা-দোকানে।

সবিতা ভেবে পায় না সব্যসাচী টেলিফোনে কেন সেই লোকটির নাম প্রকাশ করতে চাইছে না। একবার ইচ্ছে হয় বলে, আপনি নামটা বলুন-ই না। চা-দোকানে দেখা হতে তো এখনও কয়েকঘন্টা বাকি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা বলতে পারলে না সবিতা। ঐ লোকটির কাছে এমন অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন বলেই মনে হলো তার। তাই সে টেলিফোন ছাড়ার আগে সব্যসাচীকে কেবল মনে করিয়ে দিলে, দয়া করে সেদিনের মত আমাকে বেশিক্ষণ আর রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন না।

—ওরে বাবা! কৃত্রিম ভীত কণ্ঠে বলে ওঠে সব্যসাচী, অসাধারণ শাস্তির একটা খাঁড়া এখনও আমার মাথার ওপর ঝুলছে। আর একটা খাঁড়া ঝোলাতে আমি আর বিন্দুমাত্র রাজি নই। কাজেই আজ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একটুও দেরি হবে না আমার।

বাস্তবিকই তাই। সেদিন সবিতার আগেই সব্যসাচী এসে হাজির হলো সেখানে। টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবিতা কেবল তাকিয়ে থাকে সব্যসাচীর দিকে।

মৃদু হেসে সব্যসাচী বললে, খুবই কৌতূহল বোধ করছেন, কেমন?

সবিতা কোন জবাব দেয় না। তেমনি ভাবে কেবল তাকিয়েই থাকে।

সব্যসাচী একটু নড়েচড়ে বসে আবার বললে, তবে শুনুন এবার সেই বিশেষজ্ঞের অভিমত। তাঁর মতে এতগুলো লোকের মধ্যে কেউই সেই চিঠি লেখেনি।

পর্বতের মুষিক প্রসব! এত কৌতূহল, এত তোড়জোড়ের এমন করুণ পরিণতি! সবিতার মুখে কথা জোগায় না। একটি কথাও উচ্চারণ না করে সে কেবল নিঃশব্দে বসে থাকে সব্যসাচীর দিকে, তাকিয়ে।

বলতে থাকে সব্যসাচী, বিশেষজ্ঞের অভিমত যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, কে তা'হলে ঐ চিঠি লিখলে? আপনি বলেছেন আপনার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একমাত্র আপনার সেই পিসিমা ছাড়া আর কাউকেই আপনার সন্দেহ হয় না! তাই যদি হয়, তা'হলে কে সেই চিঠির লেখক?

এতক্ষণে মুখে কথা ফোটে সবিতার। মৃদু কণ্ঠে সে বললে, মণ্টা গুহও তা'হলে লেখেনি?

—না, জবাব দেয় সব্যসাচী, মণ্টা গুহ, আমি-আপনি কিম্বা আপনার অফিসের ঐ বাষট্টিজন লোকের মধ্যে কেউ-ই এই চিঠিখানা লেখার জন্যে দায়ী নয়!

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে সবিতা। তারপর বললে, এই কথাটা বলার জন্যে আপনি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন? একথা কি টেলিফোনে বলা যেত না?

সব্যসাচী জবাব দেয়, হ্যাঁ যেতো। তবে ইচ্ছে করেই আমি তা' বলিনি। এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আরও একটু কথা ছিল আমার। টেলিফোনে বললে আপনি নিশ্চয়ই আর এখানে আসতে চাইতেন না।

—কী আর কথা বলবেন! নিরাশ কণ্ঠে বলে ওঠে সবিতা, এদের মধ্যে কেউ যখন এ কাজ করেনি তখন আর কাকে যে সন্দেহ করবো বুঝতে পারছি না।

—আপনি বুঝতে না পারলেও আমি সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছি।

—কে সে? সবিতার নিরাশ কণ্ঠে কৌতূহলের সামান্য স্পর্শ!

—আমার যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকে আপনি চেনেন না।

—আমি চিনি না, অথচ আমার সম্পর্কে যা-তা লিখে আপনাদের চিঠি পাঠালে? এ কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? বিয়ে ভেঙে দিলে তার হয়তো কিছু লাভ হবে মনে করেই সে ঐ চিঠি লিখেছে।

—বিয়ে ভেঙে দিয়ে কার কি লাভ হয়েছে জানি না। তবে সেই লোক আমার অপরিচিত তা কেমন করে হয়?

একটু হেসে সব্যসাচী এবার জবাব দেয়, আপনি কেবল আপনার দিকের কথাই ভাবছেন কেন? এমনও তো হতে পারে আমার পরিচিত কেউ এ কাজ করেছে। বরের টোপর মাথায় দিয়ে আমি আপনাদের বাড়ি যাই তা' হয়তো তার মনঃপূত নয়।

—কিন্তু সেক্ষেত্রে সে তার অপরিচিত একটি মেয়ের নামে যা-তা লিখে আপনাদের কাছে চিঠি লিখতে যাবে কেন? সেটা তো খুবই অস্বাভাবিক। তেমন হলে সে আপনার নামে যা-তা লিখে আমাদের কাছে চিঠি পাঠাতো।

—হ্যাঁ, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সেটাই হয়ে থাকে। তবে এমনও তো হতে পারে

যে আপনাদের নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে না পেরে সে আমাদের কাছেই চিঠি পাঠিয়েছে।

সবিতা কোন জবাব না দিয়ে ভাবতে থাকে। সব্যসাচী আবার বললে, অবশ্য সবটাই আমার অনুমান।

সবিতা জিজ্ঞেস করে, আপনার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ নাকি ?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় সব্যসাচী, না, সন্দেহ করার মত তেমন কোন মাসী-পিসি আমার নেই।

—তা'হলে আপনার অফিসের কেউ বোধহয়

হেসে জবাব দেয় সব্যসাচী, এতক্ষণে ধরতে পেরেছেন দেখছি।

—নিশ্চয়ই কোন মেয়ে ?

—দ্যাট্স রাইট। এ না হলে কিসের ওয়াট্সন ?

সেই মুহূর্তে সবিতার মুখখানা আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে। সব্যসাচী সবিতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটু হেসে আবার বললে, না--না, যা সন্দেহ করছেন তা' নয়। তাঁকে মেয়ে না বলে মহিলা বলাই সঙ্গত। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর, যদিও খুকী সেজে থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। আমাকে স্নেহ করেন তিনি।

—স্নেহ করেন ? বিস্মিত কণ্ঠস্বর সবিতার।

জবাব দেয় সব্যসাচী, ভবিষ্যৎ জামাতাকে কে না স্নেহ করে ?

ভারি মনটা যেন হঠাৎ হাল্কা হয়ে ওঠে সবিতার। এতক্ষণে সামান্য হাসি ফুটে ওঠে তার পাতলা ঠোঁটের কোণে। হাল্কা সুরে সে বললে, তাঁকে বিমুখ না করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হলেই তো পারতেন।

—সর্বনাশ, বন্দনা আচার্যের মেয়েকে বিয়ে করার কথা তো আমি কল্পনাই করতে পারি না! মহিলা বেশ কিছু দিন আমার পেছনে ঘোরাঘুরি করেছেন। অবশেষে আমার বিয়ের কথা কাণে যেতেই আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। এখন আমার মনে হচ্ছে, তাঁর পক্ষে ঐ চিঠি লেখা অসম্ভব নাও হতে পারে।

—বেশ তো, তাতে তাঁর লাভ ?

—নিজের নাক না-কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা।

সবিতা আর কোন কথা বলে না। সব্যসাচী বলতে থাকে, বন্দনা আচার্যের বাংলা লেখা জোগাড় করা আমার পক্ষে শক্ত হবে না। বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তাঁর লেখাও একবার পরীক্ষা করাতে হবে। দেখা যাক্ কি ফল হয়।

নিরুৎসাহ সবিতা বললে, চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখুন। তবে আমার তো মনে হয় না কোন ফল হবে।

কথাটা বলেই সবিতা তার ভ্রমরকৃষ্ণ কালো চোখে আশাহতের বেদনা নিয়ে

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। বিফল হলো তার সমস্ত প্রচেষ্টা। খুঁজে পাওয়া গেল না সেই পত্রলেখককে। সে রয়ে গেল পর্দার আড়ালে, আর সম্ভবতঃ চিরদিন সেখানেই থাকবে। বিশেষজ্ঞের সাধ্য হবে না তাকে টেনে বের করতে।

নিরাশার ছায়া ঘেরা সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করে সব্যসাচী বলতে থাকে, এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেওয়া কিন্তু ওয়াটসনের পক্ষে শোভা পায় না। আমার বিশ্বাস এটা নির্ঘাৎ বন্দনা আচার্যের কাজ। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েই সে এ কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের কাছে আপনার বিশ্রী চিঠিটার ফটোগ্রাফ আছে। পরীক্ষার জন্যে লেখার ফটোগ্রাফ তৈরি করতে হয় ও'দের। দু'এক দিনের মধ্যেই বন্দনা আচার্যের হাতের লেখা আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাবো। আমার অনুমান লেখা দু'টো হয়তো মিলে যাবে।

সব্যসাচী যতই কেন না উৎসাহ দিক, তার উৎসাহে কিন্তু উৎসাহিত হতে পারে না সবিতা। এই মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে সে যেন একটা মরীচিকার পেছনে ছোটাছুটি করছে। ফল কিছুই হবে না এতে। পর্দার আড়ালের সেই লোকটি আড়ালেই থেকে যাবে। মাঝখান থেকে তার নিজের হবে পণ্ডশ্রম।

অকস্মাৎ একটা দার্শনিক সুলভ মনোভাব এসে ঘিরে ধরে সবিতার মনটিকে—কী হবে এ সব করে? পর্দার আড়াল থেকে সেই লোকটাকে টেনে আনতে পারলে কেবল একটা মানসিক তৃপ্তি ছাড়া আর কি লাভ হবে তার? না, কোন লাভই তার হবে না। তবে কেন এই প্রচেষ্টা?

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপরীত চিন্তাও এসে উঁকি দেয় সবিতার মনের কোণে—আঙুর ফল টক নাকি? লাভ-লোকসানের প্রশ্ন তুলে সে নিজের বিফলতার গ্লানি ঢাকতে চাইছে না তো? তা' না হলে এই ধরনের ভাবনা তার মনে এতদিন উদয় হয় নি কেন?

হঠাৎ সবিতা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সব্যসাচীর চোখের দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, এই ক'টা দিন আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আপনি না থাকলে এই চেষ্টাটুকুও সম্ভব হতো না। কাজেই, মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না।

প্রত্যুত্তরে সব্যসাচী সামান্য হেসে বললে, ধন্যবাদ না জানিয়ে বড় করে তুলতে চান বুঝি? তা' আপনার যা ইচ্ছে করুন, তবে এই সুযোগে একটামাত্র অনুরোধ আপনাকে জানিয়ে রাখছি। দয়া করে আমাদের পরিবারকে ভুল বুঝবেন না। এই চিঠিখানার ওপর সেদিনও আমরা কোন গুরুত্ব দিই নি, আজও দিচ্ছি না।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। স্পষ্টতর এই ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্পষ্ট কোন জবাবই সবিতার মুখে জোগায় না। এটা আর এখন তার নিজের কাছে অস্পষ্ট নয় যে সেদিন ঐ চিঠিখানার ওপর সে একটু বেশি গুরুত্বই দিয়ে

ফেলেছিল। নিজের মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব্যসাচীদের যাচাই করতে গিয়ে সে ভুলই করেছিল। সেদিন অত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত না নিলেও তার চলতো। আসলে সেদিন ঐ চিঠির বয়ানটাই ঝড়ো হাওয়ার মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল তার মনের ভারসাম্য। আর তারই পরিণতিতে সেদিন সে অত তাড়াতাড়ি সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। তা'হলে কি সংশোধনের রাস্তা এখনও খোলা আছে ? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে সবিতা। জবাব পেতেও দেরি হয় না। আর, সেই জবাব পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন এক ধরনের লজ্জা এসে ঘিরে ধরে তাকে।

সব্যসাচীর কথার জবাবে সবিতা কেবল তার আয়ত চোখ দুটি মেলে তাকায় তার দিকে। সেই মুহূর্তে সেই দৃষ্টির অর্থ না বোঝার মত বোকা নয় সব্যসাচী। আনন্দে বুকটা দুলে ওঠে তার। বরফ গলতে শুরু করেছে। মন্দাকিনীর স্রোতের মুখে নৌকোর পাল তুলে দিতে এখন বোধহয় আর কোন বাধা নেই। আনন্দের আতিশয্যে দু'কাপ চায়ের দাম ষাট পয়সা মেটাতে গিয়ে সব্যসাচী দু'টাকার একখানা চকচকে নতুন নোটই চা-দোকানের ছোকরা বেয়ারাকে বকশিস দিয়ে ফেলে।

পরের দিন সবিতা অফিসে এসে ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকতেই ফাইলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সজল মিত্র তাকান সবিতার দিকে।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে সবিতা তার হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা ছোটসাহেবের টেবিলের ওপর রাখতেই গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করেন সজল মিত্র, এ গুলোর কাজ শেষ হয়েছে ?

—হ্যাঁ, স্যার। জবাব দেয় সবিতা।

—কিছু কাজ হলো এ গুলো দিয়ে ?

—হ্যাঁ স্যার, হয়েছে।

—সেই চিঠির লেখককে খুঁজে পেয়েছেন ?

—না স্যার, এদের মধ্যে যে কেউ নয় সেটুকু প্রমাণিত হয়েছে।

সজল মিত্র একটু সময় চুপ করে থেকে তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন, যাক্ গে, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই অফিসের কেউ যে এর সঙ্গে জড়িত নেই, সেটা অন্ততঃ বোঝা গেল।

সবিতা কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে।

সজল মিত্র আবার জিজ্ঞেস করেন, এর পরে আর কী করতে চান আপনি ? আমার কাছ থেকে আর কোন হেল্প যদি চান তো মোস্ট গ্ল্যাডলি আমি তা' করবো।

—আপনি আমাকে যথেষ্ট হেল্প করেছেন, স্যার। আই এ্যাম থ্যাংকফুল টু ইউ।

—নো—নো, কি আর এমন করেছি। তাও যদি সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারতেন। আমার কি মনে হয় জানেন মিস্ ঘোষ ? খুব সম্ভব এ কাজ আপনাদের পরিবারের কেউ করেছে।

— তাই হবে হয়তো। ম্লান কণ্ঠে বললে সবিতা।

চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে একটু আরাম করে বসতে বসতে অনেকটা উপদেশের সুরেই সজল মিত্র আবার বললেন, যাক্ গে, লীভ এ্যাসাইড, অল্ দোজ রাবিশ। ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কি? ড্রপ দি ম্যাস্টার।

—হ্যাঁ স্যার, তা'ছাড়া আর উপায় কি?

এর পরে অফিসের কাজ সংক্রান্ত কয়েকটা কথা বলে সবিতা ছোটসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

(পনের)

ভূতের ভয়ে ভীতু লোকের যেমন ভূতের গল্প শুনতেই বেশি ভালো লাগে, সবিতারও প্রায় সেই দশা। যে চিঠিখানা একদিন তার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল, একটা সেট্‌ল্ড ফ্যাক্টকে আন-সেট্‌ল্ড করে তুলেছিল সেই চিঠিখানা কিন্তু এখন সর্বদাই সবিতার সঙ্গী। ওখানা থাকে তার ব্যাগের মধ্যেই। সময় সুযোগ পেলেই সবিতা সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বার বার দেখার ফলে চিঠির লেখার ছাঁদগুলো তার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। চোখ বুজে অক্ষরগুলোর বৈচিত্র্য অনায়াসে সে বলে দিতে পারে।

ইদানীং এমন অবস্থা হয়েছে যে ঐ চিঠিটা যেন তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ইচ্ছে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। এতে যে তার কি লাভ তা' সে জানে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অপমান সবিতা ঐ চিঠিখানার মাধ্যমে পেয়েছিল বলেই হয়তো ওটাকে এত সহজে সে ভুলতে পারে না।

আজকাল সব্যসাচী প্রায়ই ফোন করে সবিতাকে। সেও ছোটসাহেবের মত তাকে উপদেশ দেয়—ওসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে শরীর নষ্ট করে লাভ কি? ওটাকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই ভাবতে চেষ্টা করুন না। ইতিমধ্যে সে একদিন সবিতাকে জানিয়েও দিয়েছিল যে ঐ চিঠির লেখা তার অফিসের সেই বন্দনা আচার্যের হাতের লেখার সঙ্গে মেলেনি। এ ব্যাপারের শেষ আশাটুকুও নির্মূল হয়ে গেল সবিতার।

অফিসে নিজের ঘরে বসে কাজ করছে সবিতা। টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল। একটা ফাইল খোলা রয়েছে তার চোখের সামনে। সেই ফাইল থেকে দরকারী নোট নিচ্ছিল সে।

অকস্মাৎ সেই ফাইলের মধ্যে কয়েক লাইন ইংরেজি নোটের ওপর নজর পড়তেই চোখজোড়া আটকে যায় তার। এই সেই নোটটি —

Send an Express
telegram to Newyork
stating that the
value of the goods
should bee paid
by 30th.
Contact the
local representative
of the Company

মনের সমগ্র একাগ্রতা দিয়ে সেই মুহূর্তে কেবল সেই ইংরেজি লেখার দিকেই তাকিয়ে থাকে সবিতা। ভুলে যায় অফিসের কাজের কথা, ভুলে যায় নিজের অস্তিত্ব। একটা অজানা জগতের লৌহদ্বার যেন একটু একটু করে খুলে যেতে থাকে তার চোখের সামনে। সেই জগতের নাম লেখার জগৎ। স্থির প্রকৃতি ও অস্থির পুরুষের মিলনে সৃষ্ট জীবজগতের মত স্থির কাগজ ও অস্থির লেখনীর মিলনে যে অক্ষরের সৃষ্টি হয় তারাও যেন ঐ জীব জগতের মত সজীব, প্রাণচঞ্চল। মানুষের চেহারা ও প্রকৃতির মত ওরাও যেন প্রত্যেকেই আলাদা। গোটা পৃথিবীর সাড়ে তিনশত কোটি মানুষের মধ্যে বড়জোর কয়েকশত মানুষ মাত্র খোঁজ রাখে সেই জগতের। সেই মানুষগুলোকেই বলা হয় হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ।

সবিতা বিশেষজ্ঞ নয়। একটা সওদাগরী অফিসের সাধারণ একজন রিসেপশনিস্ট সে। কিন্তু মনের একান্ত বাসনা ও ঐকান্তিকতাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই অপরিচিত জগতের ফটকের সামনে। সেই প্রাণচঞ্চল জগতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সবিতা। এও কি সম্ভব? সত্যিই কি অক্ষরের প্রাণ আছে?

কিন্তু নিজের মনেই যে প্রাণের স্পন্দন টের পাচ্ছে সবিতা। এই ইংরেজী লেখার মধ্যে যে "নিউইয়র্ক" শব্দটি রয়েছে, ওর ইংরেজি 'এন্' অক্ষরটি যেন পেলিক্যান পাখির মত তার লম্বা ঠোঁটটি বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইংরেজি নামধারী ঐ পেলিক্যান পাখির ঠোঁটের সঙ্গে গ্রাম বাংলার কোন্ পাখির তুলনা চলতে পারে? মাছরাঙ্গা, না বক? বকই বটে। সাইজে ছোট হলেও বাংলার বকের ঠোঁটই অনেকটা পেলিক্যানের মত। কিন্তু তাই বলে ইংরেজি 'এন্' অক্ষরটির সঙ্গে তো বাংলা কোন অক্ষরের তুলনা চলতে পারে না! সব্যসাচীর সেই পরিচিত বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকই তো নাকি বলেছেন যে কাজলের সঙ্গে জলের তুলনা হয় না। কাজেই ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের তুলনা করতে যাওয়া বোকামী ছাড়া আর কি?

কিন্তু যতই বোকামী হোক্, সবিতার স্পষ্ট মনে পড়ে এই ধরনের ইংরেজি 'এন্' বাংলা লেখার মধ্যে কোথায় যেন সে দেখেছে। কথাটা শুনলে সেই বিশেষজ্ঞ নিশ্চয়ই হাসবেন, কিন্তু সবিতা নিরুপায়। নিজের স্মৃতিশক্তিকে সে অবিশ্বাস করবে কেমন করে?

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই বুকটা কেঁপে ওঠে তার। ভয়ে নয়, আনন্দে। সবিতা তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগ থেকে সেই ইনল্যাণ্ড চিঠিখানা বের করে মেলে ধরে ঐ ইংরেজি লেখার পাশে। হ্যাঁ, ঠিক্। অবিকল একরকম। চিঠির বাংলা লেখার 'ই-কার'-গুলো অবিকল ঐ ইংরেজি 'এন্'-এর মত। এতটুকু তফাৎ

কোথাও নেই। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! ইংরেজি-বাংলায় এমন আশ্চর্য মিল কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? তবে কি—তবে কি—

সহসা হাসি পায় সবিতার। হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল,—তার অবস্থাও যে তেমনি। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ যেখানে বলেন 'জলে—কাজলে তুলনা চলে না' সেখানে তার মত একজন মূর্খ বাংলার সঙ্গে ইংরেজি লেখার তুলনা করতে বসেছে! সত্যিই বোধহয় সে পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু নিজের চোখজোড়াকে কেমন করে অবিশ্বাস করে সবিতা? সে যে স্পষ্ট 'এন্'-এর মধ্যে 'ই-কার' দেখতে পাচ্ছে। কেন হচ্ছে এমন আশ্চর্য মিল? কে এর জবাব দেবে?

অফিসের কাজ-কর্ম শিকেয় তোলা থাকে। আশ্চর্য কৌতূহল নিয়ে সবিতা নিবিষ্ট মনে কেবল তাকিয়ে থাকে ফাইলের সেই ইংরেজি লেখা ও বাংলা চিঠিটার দিকে।

অকস্মাৎ ফাইলের আর একটি অক্ষরের ওপর চোখ পড়তেই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় সবিতা। অক্ষরটি হচ্ছে ইংরেজি 'সেন্ড' শব্দের 'এস্'। এই 'এস্' অক্ষরটি যে হুবহু মিলে যায় বাংলা চিঠির মহাশয় শব্দের 'ম'-এর সঙ্গে।

আনন্দে উত্তেজনায় সবিতা অধীর হয়ে ওঠে। আর্কিমিদিসের মত 'ইউরেকা—ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তার। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়, রহস্য সমাধানের সূত্র হাতে পেয়ে কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সও বোধহয় এমনি উত্তেজনাই অনুভব করতেন।

না, আর দেরি নয়। এখনই একবার ওয়াট্‌সনের উচিত শার্লক হোম্‌সে অর্থাৎ সব্যসাচীকে খবর দেওয়া। এই নব্য শার্লক হোম্‌সটির আর কোন ক্ষমতা না থাকুক সঠিক পথ দেখাবার মত বুদ্ধি অবশ্যই আছে। এই মুহূর্তে এই লোকটিকে বড়ই প্রয়োজন সবিতার।

তিন-চারবার টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়েও এন্‌গেজড্ টোন ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না সবিতা। বিরক্ত হয়ে ওঠে সে টেলিফোন কর্তৃপক্ষের ওপর। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ওঁদের যন্ত্রপাতিগুলো প্রয়োজনের সময় সাড়া না দিতেই অভ্যস্ত।

বিরক্ত সবিতা একবার নিজের হাত ঘড়িটির দিকে তাকায়। অফিস ছুটি হতে আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি। অফিসে হানা দিয়েও সে ধরতে পারবে না সব্যসাচীকে। তার চাইতে সোজা তার বাড়িতে গেলেই হয়তো দেখা পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সব্যসাচীর বাড়িতে কেমন করে যাবে সবিতা? সেখানে অনেকেই

তাকে চেনে। একাধিকবার তাঁরা কনে দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের কৌতূহলী প্রশ্নের কী জবাব দেবে সে?

অত ভাবনা-চিন্তা করার সময় নেই সবিতার। সব্যসাচীর সঙ্গে আজই তার দেখা করার প্রয়োজন। তাতে যে যা ভাবে ভাবুক।

বিয়ে ভেঙে যাবার পর থেকে সব্যসাচীর মা লাবণ্যময়ী বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র ছেলে সব্যসাচীকে অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি করাতে পারেন নি তিনি। মায়ের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, একটা উড়ো চিঠিকে উপলক্ষ করে যে একটা বিয়ে ভেঙে যাবে তা' আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না, মা। এর পরিণতি না দেখে আমি অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি নই।

—কি পরিণতি দেখতে চাস্ তুই? জিজ্ঞেস করেছিলেন লাবণ্যময়ী।

জবাব দিয়েছিল সব্যসাচী, ঐ চিঠির পেছনে কী আছে? কে আছে?

—তাতে তোর লাভ?

—না মা, লাভ-লোকসান কিছু নেই। একটা প্রচণ্ড কৌতূহল। সেই কৌতূহল মিটিয়ে তবেই আমি বিয়ে করবো। ঐ ধরনের একটা চিঠির ভিত্তিতে যে পাত্রী নিজের বিয়ে নিজেই ভেঙে দেবার মত জেদ ধরতে পারে তার মনটাকে একটু যাচাই করতে চাই আমি।

—কি বলছিস তুই? পাত্রপক্ষ হয়ে আমরা পাত্রীপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকবো?

—না মা, নির্ভর করে থাকবো কেন? ঐ মেয়েকেই যে আমি বিয়ে করবো সেকথা তো বলিনি। আমি কেবল বলছি যে বিষয়টির একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

লাবণ্যময়ী এরপর আর কিছু বলেন নি। ছেলে মুখে যা-ই বলুক, তার মনের কথা বুঝতে মায়েব একটুও অসুবিধে হয় নি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি কেবল চুপ্ করে ছিলেন। অবশেষে একদিন ছোট জামাতা সুদীপকে কাছে পেয়ে ছেলের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই সুদীপ হেসে বলেছিলেন, আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে, নইলে অমন একটি পাত্রী এভাবে হাতছাড়া হবে কেন? কত পাত্রীই তো দেখলেন, কিন্তু সবদিক বিচার করে অমন আর একটি পাত্রীও কি পেয়েছেন?

—তা' তো ঠিকই বাবা, মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন লাবণ্যময়ী, আমারও তো মেয়েটিকে খুবই পছন্দ হয়েছিল। যেমন দেখতে-শুনতে, তেমন কথা-বার্তা। মনে মনে ভেবেছিলাম, ঐ মেয়ে বউ হয়ে এসে আমার ঘর আলো করে বসবে। কিন্ত সেই বিশ্রী চিঠিটা—

—যতদূর জেনেছি, ঐ চিঠিটা স্রেফ মিথ্যে রটানো ছাড়া আর কিছু নয়।

—তাই যদি হবে তাহলে ওরা বিয়ে ভেঙে দিলে কেন? আমরা তো দিই নি।

— আপনার ছেলে তো সেটাই জানতে চেষ্টা করছে।

—তারপরে কি ঐ মেয়েটিই আমার ঘরে আসবে? লাবণ্যময়ীর কণ্ঠে আগ্রহের সুর।

জবাবে বলেছিলেন সন্দীপ, আমি তার কি জবাব দেব? সেটা নির্ভর করছে সেই মেয়ে ও আপনার ছেলের ওপর। কথাটা শেষ করে সন্দীপ কেবল মুখটিপে একটু হাসেন।

জামাতার মুখের দিকে তাকিয়ে লাবণ্যময়ী যা বোঝার বুঝে নিলেন। মনে মনে হয়তো বললেন, আমাদের সময়ে দেখাশোনা করে বিয়ে হতো, একালে ভাব করেও বিয়ে হয়। কিন্তু দেখাশোনা ও ভাবের খিচুড়ি বাস্তবিকই এক বিচিত্র ব্যাপার। সেই বিচিত্র ব্যাপারটাই এরা ঘটাতে চলেছে নাকি?

কড়া নাড়ার শব্দে লাবণ্যময়ী দরজা খুলে সামনে দাঁড়ানো সবিতাকে দেখেই বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, তুমি মা এখানে? কী ব্যাপার? কথাটা বলেই তিনি সবিতার একখানি হাত ধরে মৃদু আকর্ষণে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসেন। সারা মুখে-চোখে তার আনন্দের উচ্ছ্বাস। তিনি যেন বধূ বরণ করে নিয়ে চলেছেন।

উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর আসার পরে সব্যসাচীর মায়ের ভাব-ভঙ্গিতে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল সবিতা। একটা ঢোক গিলে মৃদু কণ্ঠে কেবল বললে, অফিসের একটা ব্যাপারে আপনার ছেলের সঙ্গে—

কথাটা আর শেষ করতে পারে না সবিতা। সব্যসাচীর মা কি বুঝলেন তিনিই জানেন। সবিতার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তা বেশ করেছো,মা। দু'দিন আগেই না হয় এসে দেখে গেলে।

ধরণী দ্বিধা হও! বাংলাদেশের কোন মেয়ে কোন কালে এমন কঠিন বিপদে পড়েছে বলে সবিতা শোনে নি। সেই মুহূর্তে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার! অফিস ফেরত সব্যসাচী সেইসময় বাড়ি এসে না পড়লে প্রৌঢ়া লাবণ্যময়ী তার ভাবী পুত্রবধূকে হয়তো আরও কিছু শোনাতেন।

সব্যসাচীকে দেখে খানিকটা ভরসা পায় সবিতা। আর সব্যসাচীর চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। তাদের বাড়িতে সবিতার এই আকস্মিক উপস্থিতি কল্পনারও অতীত।

সবিতা কিন্তু সব্যসাচীকে বেশিক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয় না। কোন ভূমিকা না করে সোজাসুজি বললে, এখনই একবার সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের

কাছে যেতে হবে। আমার মনে হয় এতদিনে সেই চিঠির লেখককে বোধহয় আমি খুঁজে পেয়েছি।

—কে সে? জিজ্ঞেস করে সব্যসাচী। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে লাবণ্যময়ী কেবল তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে।

সব্যসাচীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সবিতা তার ব্যাগ থেকে অফিস ফাইলের সেই ভাঁজকরা পাতাখানা বের করে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

ভাজ-খুলে কাগজখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সব্যসাচী বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, এ যে দেখছি ইংরেজি।

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই ইংরেজির সঙ্গেই তিনি বাংলা চিঠিখানা মিলিয়ে দিতে পারবেন।

—কিন্তু তিনি তো আগেই বলেছেন তা' সম্ভব নয়। জলে-কাজলে নাকি মেলানো যায় না।

—দয়া করে আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। আমার মনে হয় এবার তিনি সম্ভব বলেই রায় দেবেন।

সব্যসাচী তবুও দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি যে সেদিন স্পষ্টই বললেন—

কথাটা শেষ করতে পারে না সব্যসাচী। তার আগেই ছেলের দিকে তাকিয়ে লাবণ্যময়ী বলে ওঠেন, তোদের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মেয়েটা যখন বলছে তখন ওর কথামত সেখানে যেতে আপত্তির কি আছে?

মায়ের এই হঠাৎ পক্ষাবলম্বনে মনে মনে হেসে সব্যসাচী জবাব দেয় সবিতাকে, এখনই যেতে হবে?

সবিতা মাথা নেড়ে সায় দিতেই লাবণ্যময়ী এবার অনুযোগের সুরে বলতে থাকেন, সেকি মা, অফিস থেকে তেতে-পুড়ে এলে, কিছু মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করো। তারপর ধীরে সুস্থে—

সব্যসাচী সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েই তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকলে লজ্জায় সে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাবণ্যময়ীর উদ্দেশে বলে ওঠে, না মা, যেতেই যখন হবে তখন আর একটুও দেরি করা চলবে না। তারপর সবিতাকে ইঙ্গিত করে বললে, চলুন।

কৃতজ্ঞতায় সব্যসাচীর ওপর মনটা ভরে ওঠে সবিতার। প্রৌঢ়া লাবণ্যময়ীকে প্রণাম করে মাথা তুলতেই লাবণ্যময়ী সবিতার চিবুক স্পর্শ-করে মৃদু কণ্ঠে আশীর্বাদ করেন তাকে, রাজেন্দ্রাণী হও মা। এ বাড়ি আলো করে এসে বসো।

মাথা নীচু করে ত্রস্ত পায়ে সব্যসাচীর পিছে পিছে সবিতা এসে দাঁড়ায় রাস্তার ফুটপাথে। এতক্ষণে একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করে সে। আর ঠিক সেই

মুহূর্তে সবিতার দিকে তীর্যক চোখে একবার তাকিয়ে চাপা হাসিমুখে বলে ওঠে সব্যসাচী, বাব্বাঃ, মা'র আশীর্বাদের কি ঘটা !

কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমনি ভঙ্গিতে সবিতা কেবল তাকিয়ে থাকে রাস্তার চলমান যান-বাহনের দিকে।

এবার একটু জোরে হেসে উঠে সব্যসাচী বললে, মায়ের হাত থেকে তো উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। এবার বলুন, সত্যিই কি আপনি সেই বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে চান ?

হাতের ছোট্ট রুমালখানা মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে সবিতা বললে, ক্ষেপেছেন ? আমার যেতে বয়েই গেছে। আপনি যাবেন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ যে একেবারে হুকুম। এমন একটা পরিস্থিতিতে এই ধরনের হুকুম তামিল করতে যে কোন পুরুষই প্রস্তুত।

তবুও দ্বিধার সুরে সব্যসাচী আবার বললে, কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে বাংলা অক্ষরের তুলনা—

সব্যসাচীর কথার মাঝখানেই সবিতা আবার বলে ওঠে, সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে আমার কথা জানিয়ে বলবেন যে যদিও আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবুও আমার সাদা চোখে একটা অদ্ভুত মিল ধরা পড়েছে দু'টো লেখার মধ্যে। হয়তো এগুলো নেহাত মামুলি, হয়তো এই মিল কোন কিছুই প্রমাণ করে না, কিন্তু তবুও তাঁকে এ কথা জানাবেন।

—কি সেই মিল ?

একটু দ্বিধা করে জবাব দেয় সবিতা, ইংরেজি 'এন্' ও 'এস' অক্ষরের মধ্যে আমি বাংলা 'ই-কার' ও 'ম' দেখতে পেয়েছি।

বেশ বলবো। কথাটা বলেই সব্যসাচী একটু সময় চুপ্ করে থাকে। তারপর মৃদু হেসে আবার বললে, কিছু মনে করবেন না, আপনার জন্যে সত্যিই আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

—কিসের দুশ্চিন্তা ? সবিতাও হেসে জিজ্ঞেস করে।

জবাবে সব্যসাচী বললে, কেউ যখন আকাশের চাঁদের মধ্যে নিজের প্রিয়তমার মুখখানি দেখতে পায়, কিম্বা অন্ধকার আকাশের গায়ে অসংখ্য তারার মধ্যে আপন প্রিয়তমার শাড়ির রুপোলী চুমকির কাজ খুঁজে পায়, তখনই তার প্রিয়জনেরা চিন্তিত হয়ে ওঠে। তেমনি আপনিও যখন ইংরেজির মধ্যে বাংলা অক্ষর দেখতে শুরু করেছেন তখন সেটা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

কৃত্রিম গম্ভীর মুখে সবিতা বললে, বেশ তো, পাগল যদি হই তো হবো ! তাতে আপনার কি ?

—কিছুমাত্র না—কিছুমাত্র না, বলতে থাকে সব্যসাচী, কলকাতা থেকে রাঁচীর দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়।

সবিতা এবার তাড়া দেয় সব্যসাচীকে, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে এমনি সব আবোল-তাবোল বকবেন, না সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের কাছে যাবেন ?

বলে ওঠে সব্যসাচী, এখন যে দেখছি মুখে খই ফুটছে। একটু আগে মা'র সামনে দাঁড়িয়ে যে ঘামছিলেন।

—ঘামবো বেশ করবো। আপনি যাবেন কিনা বলুন।

—নিশ্চয়ই যাবো। না গিয়ে উপায় আছে আমার ? তবে, তার আগে একটা রেস্তোরায় গিয়ে কিছু খেয়ে নিলে হতো না ? দুজনেই যখন অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি তখন—

—না, আমার একেবারেই খিদে পায়নি।

কৃত্রিম গম্ভীর সুরে বলতে থাকে সব্যসাচী, মায়ের হাত থেকে পালিয়ে এসেছেন বলে ছেলের হাত থেকে কিন্তু রেহাই পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই আপনার। আধঘণ্টা পরে বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে আপনার সেই ইংরেজি-বাংলার মিলগুলো গরমিল হবে না নিশ্চয়ই। কাজেই এবার দয়াকরে চলুন একটা ভালো রেস্তোরায়।

রেস্তোরায় ঢুকতে ঢুকতে সবিতা বললে, আপনি যতই কেন না আমাকে ঠাট্টা করুন, ইংরেজি-বাংলার ঐ মিলগুলো সত্যিই আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছে। বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক আমার কথা শুনে হয়তো হাসবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন তাঁকে, দিয়ে একবার ভালোমত যাচাই না করিয়ে আমি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছি না।

হেসে বললে সব্যসাচী, সেই বিশেষজ্ঞের সাধ্য কি শার্লক হোমসের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াটসনের সন্দেহকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তার অপমান করে ? আপনার ইচ্ছেমত ব্যাপারটা যাচাই করাতেই হবে, তবে তার আগে যা-চাই তা হচ্ছে এক কাপ গরম কফি, কি বলেন ?

(ষোল)

রাত প্রায় দশটা। সারাদিন আদালতে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাইরের ঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসেছিলেন এ্যাড্ভোকেট পবিত্র ঘোষ। এ লাইনে যথেষ্ট পসার তাঁর। সেই সুবাদে পরিশ্রমও করতে হয় প্রচুর।

প্রয়োজন শেষে একজন একজন করে মক্কেলরা সবাই বিদায় নিলে। পবিত্রর জুনিয়র এ্যাড্ভোকেটও ক্লান্ত দেহে চলে গেল একসময়। হাতের আইনের মোটা বইখানা বন্ধ করে পবিত্রও উঠবো উঠবো করছিলেন। ঠিক্ সেই মুহূর্তে একখানা ট্যাক্সি এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই বিরক্তিতে কপালটা কুঁচকে উঠলো পবিত্রর। এত রাতে আবার মক্কেল! এরা কি তাঁকে একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না?

ট্যাক্সি থেকে নেমে একটি যুবক এগিয়ে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞেস করে, এটা কি এ্যাড্ভোকেট পবিত্র ঘোষের বাড়ি?

পবিত্র যা সন্দেহ করেছেন ঠিক তাই। হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনেই বোধহয় যুবকটি এত রাতে এসে হাজির হয়েছে। এখন আবও প্রায় আধঘন্টা চল্লিশ মিনিটের ধাক্কা। ধৈর্য ধরে সবকিছু শুনতে হবে। দু' একটা জবাবও দিতে হবে। তারপর পরের দিন সকালে আসার নির্দেশ দিয়ে বিদেয় করতে হবে।

যুবকটির প্রশ্নের জবাবে পবিত্র বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো? চেষ্টা করেও কিন্তু পবিত্র সেই মুহূর্তে নিজের বিরক্তি চাপতে পারলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই প্রকাশ পেল সেই বিরক্তি।

যুবকটি এবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, একটা বিশেষ দরকারে আমাকে আসতে হয়েছে। অবশ্যি ব্যাপারটা—

পবিত্র যুবকটিকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন, রাত অনেক হলো। আমিও ভয়ানক টায়ার্ড। আপনি যদি কাইন্ড্লি কাল সকালে--

—না--না, বলে ওঠে যুবকটি, প্রয়োজন ঠিক্ আপনার সঙ্গে নয়। একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার বোনের সঙ্গে এখনই একটু কথা বলার দরকার।

ভ্রু-যুগল কুঁচকে ওঠে পবিত্রর। কয়েক মুহূর্ত যুবকটির দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি একটু দৃঢ় কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করেন, আমার বোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি? আপনি কি ওর অফিসেই চাকরি করেন?

—না, ঠিক ঐ অফিসে চাকরি করি না। তবে—। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথাটা বলতে বলতে যুবকটি থেমে যায়।

পবিত্র আবার জিজ্ঞেস করেন, কি নাম আপনার?

নাম বলতে গিয়ে আবার একটু ইতঃস্তত করে যুবকটি। তারপর বললে, আমার নাম সব্যসাচী বোস।

—সব্যসাচী বোস! নামটা পুনরাবৃত্তি করে কি যেন ভাবতে থাকেন পবিত্র। খুব যেন অপরিচিত নয় নামটা।

ঠিক্ এমনি সময় ঘরে প্রবেশ করেন বাসন্তী। একটু আগেই তিনি ভেতরের

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেতরে ঢুকে সব্যসাচীর দিকে তাকিয়েই তাকে চিনতে পেরে পবিত্রকে বললেন, তুমি তো দেখনি, তাই এঁকে চিনতে পারছো না। আমি চিনেছি। ভবানীপুরের ডাক্তার এস. বোসের ছেলে ইনি।

—সেকি! বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়েন পবিত্র। সব্যসাচীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, এ কথা আগে বলতে হয়! আমি ভাবলাম এত রাতে আবার কোন মক্কেল এলো।

মোটা লেন্সের চশমার ফাঁকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বাসন্তী গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমার তো কেবল ঐ এক চিন্তা। লোক দেখলেই তোমার মক্কেল বলে মনে হয়। তারপর সব্যসাচীর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠে আবার বললেন, তা, এখানে কেন? চলুন, ভেতরে চলুন।

—না—না, ভেতরে যাবার দরকার হবে না। সলজ্জ কণ্ঠে সব্যসাচী বললে, দয়া করে আপনার ননদকে একবার ডেকে দিন। কয়েকটা জরুরী কথা বলেই আমি চলে যাবো।

—না, তা' হয় না, এবার বলে ওঠেন পবিত্র, যখন এখানে এসেই পড়েছেন তখন ভাই আপনাকে বাইরের ঘর থেকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারি না। চলুন, ভেতরে চলুন।

অগত্যা সব্যসাচীকে পবিত্রর পিছে পিছে এসে ঢুকতে হয় তাঁদের ড্রইং রুমে।

বাড়ির ঝিয়ের মারফৎ তৎক্ষণে দোতলায় নিভাননীর কাছে খবর পৌঁছে গেছে। তিনি সাধারণতঃ রাতে নীচে নামেন না। কিন্তু সব্যসাচীর আসার খবর পেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসেন তিনি। একটু সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন সব্যসাচীর দিকে। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ, ভালো। বলতে বলতে সব্যসাচী উঠে এসে নিভাননীর পায়ের ধুলো নেয়। তারপর পবিত্রর দিকে এগিয়ে যেতেই পবিত্র তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, না—না ভাই, আমাকে দরকার নেই। মাকে প্রণাম করেছেন, ওতেই হবে।

নিভাননী এই সময় পবিত্রর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, একরত্তি ছেলে, একে তুই আপনি-আজ্ঞে বলছিস কেন রে, খোকা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমাকে আপনারা তুমিই বলবেন। ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে সব্যসাচী বললে।

সবিতার সঙ্গে দেখা করতে সব্যসাচীর এত রাতে হঠাৎ এ বাড়িতে আগমনে মনে মনে বেশ একটু কৌতুক বোধ করেন স্কুল শিক্ষয়িত্রী বাসন্তী। এ ধরনের ব্যাপারে তাঁর মত চরিত্রের একজন মহিলার বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিরক্তির বদলে মনে মনে একটু খুশিই হন তিনি। সব্যসাচীকে বললেন, এত রাতে যখন এখানে ছুটে এসেছো তখন দরকার নিশ্চয়ই খুব জরুরী। সবুর তো এখন মধ্যরাত। দেখি ওকে জাগাতে পারি কিনা।

—তাই নাকি ? সব্যসাচী বললে, ঘুমিয়ে পড়েছেন যখন তখন বরঞ্চ থাক্‌। কাল সকালে না হয়—

জবাব দেন বাসন্তী, না ভাই থাকবে কেন ? তুমি এতদূর ছুটে এসেছো, আর ও একটু উঠতে পারবে না ? আমি ওকে ধরে নিয়ে আসছি। কথাটা শেষ করেই বাসন্তী চলে যাবার জন্যে পা বাড়ান। সেই মুহূর্তে সব্যসাচীর মনে হলো বাসন্তীর ঐ সদা গম্ভীর মুখে এক ঝলক খুশির হাসি দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল : শুধু তাই নয়, তাঁর মুখে 'ডেকে আনছির' বদলে ঐ 'ধরে আনছি' কথাটাও যেন অর্থবহ।

বৌদির মুখে সব্যসাচীর আগমনের খবরে আনন্দ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের রক্তস্রোত হঠাৎ যেন মাতামাতি শুরু করে দেয়। সব্যসাচী নিশ্চয়ই কোন ভালো খবর এনেছে। তা'ছাড়া তাদের বাড়িতে সব্যসাচীর এই আকস্মিক আগমনটাই তো একটা মস্ত খবর। সেদিন সন্ধ্যায় সব্যসাচীর বাড়িতে তার মা যে কথাগুলো বলেছিলেন তার সঙ্গে সব্যসাচীর এই আগমনের যেন কোথায় একটা সম্পর্ক আছে।

বৌদির সঙ্গে ড্রইংরুমে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই কিন্তু সবিতা বুঝতে পারে যে একটা পর্বতপ্রমাণ লজ্জা যেন অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছে তাকে। ছি-ছি, মা, দাদা-বৌদির সামনে ঐ লোকটির সঙ্গে সে কথা বলবে কেমন করে ? ওঁরাই বা কি ভাববেন ? লোকটা যেন কী ! এত রাতে এখানে আসার কি দরকার ছিল ? কাল অফিসে ফোন করলেই তো পারতো। ঘন্টা কয়েক দেরি হলে কি আসে যেতো।

সদ্য ফোটা একটি ফুলের মত সুন্দর সবিতার সদ্য ঘুম ভাঙা ঢলঢলে মুখখানার দিকে অপলক চোখে একটু সময় তাকিয়ে থাকে সব্যসাচী। তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবিতাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, একটা দারুণ সুসংবাদ এনেছি আপনার জন্যে। সত্যি, আশ্চর্য আপনার চোখের দৃষ্টি ! বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক তো বললেন যে এরকম ঘটনা নাকি এর আগে এদেশে কখনও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন ভাষার অক্ষরের মধ্যে মিল খুঁজে বের করে লেখককে আবিষ্কার করার এই প্রাথমিক কৃতিত্বটুকু নাকি সম্পূর্ণ আপনার। তিনি স্বীকার

করেছেন যে ক্ষেত্রবিশেষে জল ও কাজলের মধ্যেও নাকি তুলনা চলে। কথাটা শেষ করেই মৃদু হাসে সব্যসাচী।

গুরুজনদের উপস্থিতিতে সব্যসাচীর এমনি উচ্ছ্বাসে লজ্জা আরও বেড়ে ওঠে সবিতার। সব্যসাচীর দেওয়া খবরে সে নিজেও উত্তেজনা বোধ করছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে তার। পর্দার আড়াল থেকে সেই চিঠিখানার লেখককে টেনে বের করে আনা হয়েছে। এবার তাকে হাজির করতে হবে জনসমক্ষে।

নিজেকে সংবরণ করে মৃদু কণ্ঠে সবিতা বললে, তা'হলে শেষ পর্যন্ত লেখা দু'টো মিলেছে?

—মিলেছে মানে? ঐ বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের এই সাবজেক্টের ওপর প্রচুর পাণ্ডিত্য। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, গোটা ভারতজোড়া ওঁর খ্যাতি। উনি স্পষ্ট অভিমত দিলেন যে লেখা দু'টো নিশ্চিৎ এক লোকের। এর মধ্যে এতটুকু সন্দেহ নেই। উনি তো আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন।

সব্যসাচীর কথায় সবিতার মুখখানা আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। লোকটা যেন কী! সামনে সবাই দাঁড়িয়ে, আর লোকটা নির্বিকারভাবে বলে চলেছে যে সেই বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক নাকি তার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

উপস্থিত অন্য সবাই এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও আঁচ করছিলেন তাঁরা। পবিত্র এবার জিজ্ঞেস করেন সবিতাকে, সেই বিশ্রী চিঠিটার লেখকের খোঁজ পেয়েছিস নাকি? কে সে? তোদের অফিসের কেউ নাকি?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে সায় দেয় সবিতা।

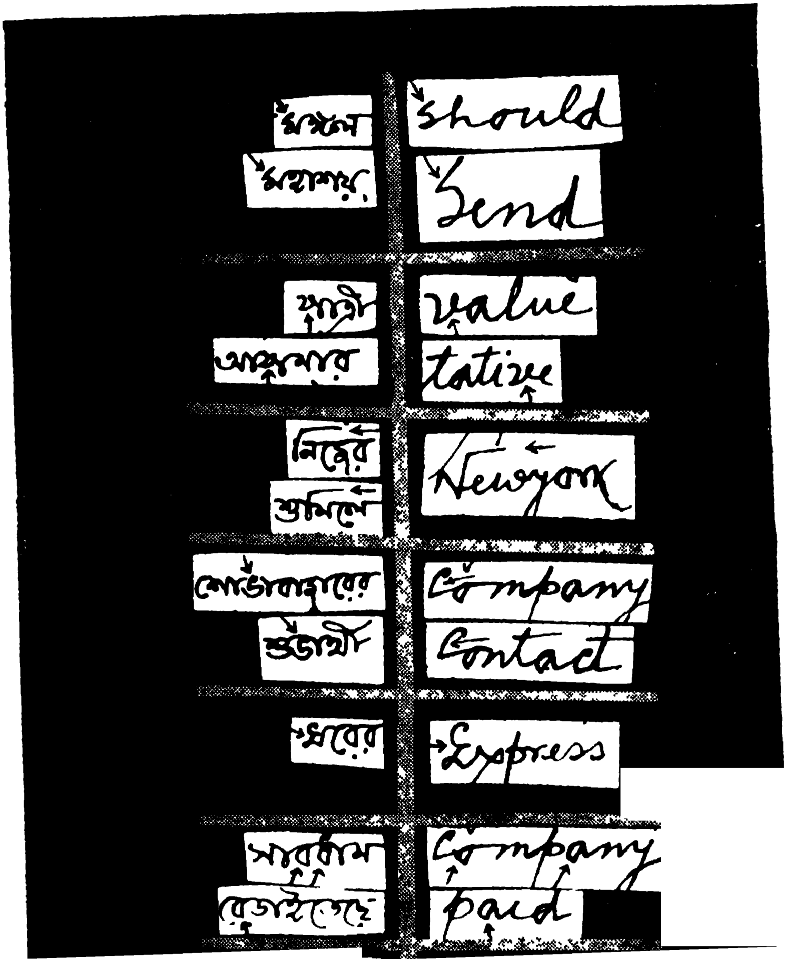
সব্যসাচী জিজ্ঞেস করে, কী নাম তার?

সবিতা সে কথার জবাব না দিয়ে নিজেই আবার জিজ্ঞেস করে, চিঠিটা ও সেই ফাইলের কাগজখানা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?

—নিশ্চয়।

সঙ্গের এ্যাটাচি খুলে কাগজগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখে সব্যসাচী। তারপর ভাঁজ করা আর একখানা লম্বা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললে, এটা হচ্ছে একখানা চার্ট। উনিই তৈরি করে দিয়েছেন। লেখার ফটোগ্রাফ থেকে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরগুলো কেটে নিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দু'টো লেখার মধ্যে মিলগুলো এতে দেখানো হয়েছে।

সব্যসাচী থামতেই পবিত্র টেবিলের কাছে সরে এসে পরের পৃষ্ঠার সেই চার্টখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন।



should
Send
value
tative
Newyork
Company
Contact
Express
Company
paid

চার্টখানা দেখতে দেখতে পবিত্র হঠাৎ বলে ওঠেন, সত্যিই অদ্ভুত! প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আদালতে হাতের লেখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনেক কাজ করেছি। তাঁদের কর্মক্ষমতায় মাঝে মাঝে আমি বিস্ময় বোধ করেছি। কিন্তু এই ব্যাপারটা বাস্তবিকই অভাবনীয়। ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের তুলনার কথা এর আগে কখনও শুনি নি, দেখা তো দূরের কথা। কিন্তু এই চার্টের মধ্যে যা দেখছি তাকে তো অবিশ্বাস করতে পারছি না। এ খানা দেখে ঘোর অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হবে যে লেখা দু'টো একই লোকের।

বলতে বলতে চার্টখানা হাতে নিয়ে পবিত্র তাঁর স্ত্রী ও মা'র দিকে এগিয়ে যান তাঁদের দেখাতে। আর সেই সুযোগে সবিতা ও সব্যসাচী পরস্পরের দিকে এমন এক দৃষ্টি বিনিময় করে যার অর্থ কেবল তারা নিজেরা ছাড়া আর কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়।

অবশেষে বিদায়ের পালা। সব্যসাচীকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন পবিত্র। সঙ্গে বাসন্তী ও নিভাননী। সবিতা কিন্তু ততক্ষণে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই মুহূর্তে তার মনের যা অবস্থা তাতে তার একটু একা থাকার প্রয়োজন। এত দিনের একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। অপরাধীকে এতদিনে সে চিনতে পেরেছে। আর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধের কারণটি জানবার জন্যে মনে মনে সে উৎসুক হয়ে উঠেছে। মুখরা পিসিমা কিম্বা তাঁর দেওর পো মন্টা গুহকে সে শুধু শুধুই সন্দেহ করেছিল এতদিন। আসল লোক যে এতদিন তার হাতের কাছেই চুপটি করে বসেছিল তা' সে জানতেই পারে নি।

চিন্তাস্রোতে ভাসতে ভাসতে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট করতে থাকে সবিতা। কিছুতেই ঘুম আসে না। চিঠির সেই লেখককে নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচীর প্রসঙ্গও এসে পড়ে। একটু আগে এখানে সব্যসাচীকে নিয়ে যে নাটকটুকু অভিনীত হয়ে গেল তার পরে তাদের দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে বাড়ির গুরুজনদের মনে কিছুই আর অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কাল সকালেই হয়তো বৌদি আবার ছুটবেন ভবানীপুরে। মা নিভাননীর মুখের যে হাসিটুকু এতদিন মিলিয়ে গিয়েছিল সেটুকু হয়তো আবার দেখা দেবে। দাদা পবিত্র হয়তো সিগারেট হাতে বৈঠকখানায় যেতে যেতে বৌদির প্রশ্নের জবাবে আমতা আমতা করে বলবেন, আমাকে আর জিজ্ঞেস করছো কি? সবু তোমার ননদ হলেও মেয়ের চাইতে কম নয়। ওর বিয়েতে যা ভালো বুঝবে করবে। কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের চেকে সই করার দায়িত্বটুকু আমার।

(সতের)

সেদিন অফিসে এসে স্বাভাবিক ভাবেই নিজের কাজকর্ম করতে থাকে সবিতা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে ভেতরে তার মনের মধ্যে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড এক ঝড়। তার জীবনের সেটল্‌ড ফ্যাক্টকে আন্‌-সেটল্‌ড করার জন্যে যে লোকটির বিষ মাখানো কলমটি দায়ী সেই কলমটিকে আজ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবে সে। তার মুখোস আজ খসে পড়ে বেরিয়ে পড়বে তার কদর্য মুখখানা। অফিস শুদ্ধ সবাই তাকে উপহাস করবে, টিটকারি দেবে। তার সেই দুর্গতি দেখে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করবে সবিতা।

কিন্তু সত্যিই কি সবিতা তৃপ্তি পাবে? তা'হলে তার সারা মুখে এই মুহূর্তে প্রশান্তির চিহ্ন ফুটে উঠছে না কেন? একটা দুশ্চিন্তার ছায়া কেন ঘিরে রেখেছে তার সুন্দর মুখখানাকে?

অফিসে কাজের ফাঁকে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে থাকে সবিতা। অবশেষে টিফিনের পরে এক সময় সে এসে হাজির হয় ছোট সাহেবের ঘরে।

সজল মিত্র সবিতাকে দেখে তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর মুখের ওপর যথাসাধ্য একটা হালকা ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে বললেন, কি খবর মিস্‌ ঘোষ, কোন জরুরী ফাইল আছে নাকি?

—না স্যার, শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা, তবে একটা জরুরী কথা আছে।

—বেশ, বসুন।

সবিতা বসতেই মিত্তির সাহেব জিজ্ঞেস করেন, অফিস সংক্রান্ত, না ব্যক্তিগত?

—দুটোই বলতে পারেন, স্যার।

—বেশ, তবে বলুন।

একটা ঢোক গিলে সবিতা আবার বললে, সেই চিঠির লেখককে এতদিনে খুঁজে পাওয়া গেছে, স্যার।

—তাই নাকি? বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন সজল মিত্র, আমাদের অফিসের কেউ নাকি?

সবিতা মাথা নেড়ে সায় দিতেই কৌতূহলী সজল মিত্র আবার জিজ্ঞেস করেন, কে সে? কোন্‌ ডিপার্টমেন্টের?

সবিতা কোন জবাব না দিয়ে চিঠি ও সেই ফাইলের কাগজখানা এগিয়ে দেয় মিত্তির সাহেবের দিকে।

চিঠিটার ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেখানা সরিয়ে রাখতে রাখতে সজল মিত্র আবার বললেন, এটা তো আপনাকে লেখা সেই চিঠিটা ?

স্থির হয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে সবিতা।

মিত্তির সাহেব ফাইলের কাগজটা হাতে নিয়ে মুখে বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করে বলে ওঠেন, এটা কি দিলেন আমাকে ? এতে তো আমার নিজের দেওয়া নোট্ রয়েছে।

অচঞ্চল কণ্ঠে সবিতা বললে, হ্যাঁ স্যার, বিশেষজ্ঞের মতে এই ইংরেজি নোটের লেখকই এই বাংলা চিঠিখানা লেখার জন্যে দায়ি।

জলদ-গম্ভীর শব্দ জেগে ওঠে সজল মিত্রর কণ্ঠে। বললেন তিনি। বিশেষজ্ঞ ইংরেজির সঙ্গে বাংলা মিলিয়েছেন ? এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনি নি।

সেই মুহূর্তে উত্তেজনায় সবিতার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ স্যার, সেই অদ্ভুত কাজই তিনি করেছেন। আর করেছেন বলেই এই অফিসের ছোট সাহেবের মুখোস আজ খসে পড়তে বসেছে।

—কি বলতে চাইছেন আপনি, মিস্ ঘোষ ? ফাঁদে পড়া জীবের মত আর্ত কণ্ঠস্বর ছোট সাহেবের।

সবিতা সেই চার্টখানা সজল মিত্রর দিকে ঠেলে দিয়ে তেমনি দৃঢ় কণ্ঠেই বলতে থাকে, মিলগুলো একবার দেখুন, তা'হলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি।

চোখের সামনে সেই চার্টখানা মেলে রাখলেও সবিতা বুঝতে পারে ছোটসাহেবের নজর সেদিকে নেই। বিব্রত মুখে তিনি যেন কি চিন্তা করে চলেছেন। তাঁর মুখের সেই বিব্রত ভঙ্গির সঙ্গে একটু বেদনার আভাসও যেন জড়িয়ে রয়েছে।

সবিতা আবার বলতে থাকে, এবার বোধহয় আপনি স্বীকার করবেন যে বিলেতফেরত ইঞ্জিনীয়ার আপনার বিশেষ পরিচিত সব্যসাচী বোসের সঙ্গে আমার বিয়ে বন্ধ করতে আপনি নিজেই তার বাবাকে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন।

সবিতার কথাগুলো কানে যেতেই দারুণ চমকে ওঠেন ছোটসাহেব সজল মিত্র। বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে বলে ওঠেন তিনি, কি বললেন ? আপনার বিয়ে ঠিক্ হয়েছিল সব্যসাচী—আমাদের সব্যসাচীর সঙ্গে ?

—হ্যাঁ, পি. জি'র হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর সর্বেশ্বর বোসের ছেলে সব্যসাচী বোসের সঙ্গে।

চাপা বেদনাময় কন্ঠে সজল মিত্র কেবল উচ্চারণ করেন, গুড গড্ ! এটা আমি জানতাম না। বলেই তিনি মাথা নীচু করেন।

সবিতা তখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললে, নিশ্চয়ই জানতেন। নইলে তাঁর নামে চিঠি লিখলেন কেমন করে ?

কয়েক মুহূর্ত তেমনিভাবে মাথা নীচু করে থেকে একসময় ধীরে ধীরে মাথা

তোলেন সজল মিত্র। তারপর অনুশোচনার সুরে বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন মিস্ ঘোষ, সব্যসাচীর বাবা যে বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট সর্বেশ্বর বোস তা' আমি জানতাম। কিন্তু উনিই যে পি. জি'র ডাঃ এস. বোস তা' আমি জানতাম না। কথাটা শেষ করেই সজল মিত্র আবার মাথা নীচু করেন।

কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে কেবল দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, আর ছোটসাহেবের চেম্বারের সুইংডোরের বাইরে অফিস কর্মচারীদের ভিড়। রিসেপশনিস্ট সবিতা ঘোষের কন্ঠস্বর আকৃষ্ট করেছে তাদের।

বাঘের মতো অফিসার ছোট সাহেব সজল মিত্রর এমন একটা অবস্থা বাস্তবিকই কল্পনার অতীত। অপরাধের ভারে তাঁর উঁচু মাথা নীচু হয়ে রয়েছে, আর সেই দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে তাঁরই একজন সামান্য কর্মচারী সবিতা ঘোষ।

আবার ধীরে ধীরে মাথা তোলেন সজল মিত্র। অপমানে, লজ্জায় তিনি যেন সরাসরি সবিতার মুখের দিকে আর তাকাতেই পারেন না। সবিতার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বিয়ে কি ভেঙে গেছে ?

উত্তেজিত সবিতা জবাব দেয়, হ্যাঁ, আমরাই ভেঙে দিয়েছি।

একটু সময় চুপ্ করে থেকে সজল মিত্র আবার বললেন, ভেঙে যাওয়া বিয়ে কি আর জোড়া লাগানো যায় না ? সত্যিই বড় ভালো ছেলে ঐ সব্যসাচী। লাখে এমন একটি ছেলে মেলে কিনা সন্দেহ।

সবিতা কিন্তু তখনও ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। তীক্ষ্ণ কন্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, একটি কুমারী মেয়ের নামে এমন বদনাম ছড়িয়ে তার ক্ষতি করার কারণটা কি জানতে পারি, স্যার ?

কোন জবাব না দিয়ে মিত্তির সাহেব মাথা নীচু করেই থাকেন।

—চুপ্ করে রইলেন কেন ? জবাব দিন। ঝল্কে ওঠে সবিতার কন্ঠস্বর।

মিত্তির সাহেব আবার মাথা তোলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চম্কে ওঠে সবিতা। এ কোন্ ছোট সাহেব ! মুখখানা চুপ্সে গেছে তাঁর। জলভরা মেঘের মত ভারি হয়ে উঠেছে চোখ দু'টো।

মৃদু কন্ঠে সজল মিত্র বললেন, আমি যা করেছি তাতে জবাব দিতে আমি বাধ্য। তবে জবাবটা কি না শুনলেই নয়, মিস্ ঘোষ ?

—না, আমাকে শুনতেই হবে। দৃঢ় কন্ঠস্বর সবিতার।

বেদনামগ্ন মুখে এক টুক্রো ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে সজল মিত্রর। মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, না শুনলেই ভালো করতেন। জবাবটা আপনার ভালো লাগবে না।

—ভালো লাগুক বা না লাগুক, আমি শুনতে চাই।

হাতের কলমটা নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করতে করতে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করেন সজল মিত্র। তারপর প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে থাকেন, আপনাকে আমার ভালো—ভালো লেগেছিল, মিস্‌ ঘোষ। কিন্তু সে কথা কোনদিন জানতে দিই নি আপনাকে। সেই সাহস আমার ছিল না। তা'ছাড়া, ব্যাপারটা অফিস এ্যাটিকেটে বাধছিল আমার। নিজের একক নিঃসঙ্গ জীবনে চোরের মত লুকিয়ে আপনাকে নিয়ে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যেই ডুবে থাকতাম। হয়তো এমনিই চলতো। হয়তো আপনি কোন কালেই এসব টের পেতেন না। কিন্তু যেদিন আপনার বিয়ের কথা শুনলাম সেদিন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-শালীনতা সবকিছু ভুলে গেলাম আমি। সেদিন যদি বুঝতে পারতাম আপনি আমাদের সব্যসাচীর ঘর আলো করতে যাচ্ছেন, তা'হলে বিশ্বাস করুন, একাজ হয়তো করতে পারতাম না। না—কিছুতেই পারতাম না, কিছুতেই না।

বলতে বলতে মিত্তির সাহেব আবার মাথা নীচু করে থাকেন। সবিতা লক্ষ্য করে তাঁর চোখের কোল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

এমন একটা দৃশ্য ভালো লাগে না সবিতার। বাঘের মত সাহেব কাঁদছেন। রীতিমত কাঁদছেন। আর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে সবিতা।

নিজের বিয়েতে সবিতা অফিসশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। এমনকি ছোটসাহেব সজল মিত্রকেও একটা কার্ড দিতে ভোলে নি। স্বাভাবিক কারণেই সজল মিত্র সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকেন নি। কিন্তু বিনে নিমন্ত্রণে সব্যসাচীর বৌভাতে তিনি একটা দামী উপহার নিয়ে এসে হাজির হতেই সব্যসাচী বাস্তবিকই ঘাবড়ে গিয়েছিল। নিমন্ত্রণ না করার জন্যে লজ্জিত কণ্ঠে কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করতেই সজল মিত্র হেসে তার ঘাড়ের ওপর একটা হাত রেখে বলে উঠেছিলেন, সবিতা ঘোষের বিয়েকে আনন্দের সঙ্গে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি বলেই নিমন্ত্রণ পেয়েও সেখানে যাই নি। কিন্তু আজ তোমার এই বৌভাতের দিনটি বাস্তবিকই তোমার সজলদার কাছে আনন্দের দিন। তাই, নিমন্ত্রণ না পেয়েও এসে হাজির হয়েছি।

সেদিন সেই বৌভাতের আসরে সজল মিত্র যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। হাসি ঠাট্টায় তিনি একাই জমিয়ে তুললেন সেই আসর। কখন এক ফাঁকে বন দেবীর বেশে সজ্জিতা নববধূ সবিতার কাছে গিয়ে অতি সহজভাবে তার হাতে তুলে দিয়ে এলেনউপহারটি।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে। হাতের লেখার সাহায্যে লেখককে ধরে ফেলার

কৌশল নিয়ে একদিন সবিতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সব্যসাচীর। হেসে সব্যসাচী বললে, ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষর মিলিয়ে সজলদাকে আবিষ্কার করার কৃতিত্বটুকু কিন্তু তোমারই। কাজেই এবার তোমার সঙ্গে আমার স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে।

—কিসের স্থান? কৌতূহলী সবিতা জিজ্ঞেস করে।

তেমনি হেসে সব্যসাচী জবাব দেয়, গোয়েন্দার স্থান। এবার থেকে তুমিই হলে শার্লক হোমস্ আর আমি ওয়াটসন, তুমিই প্রধান আর আমি অপ্রধান। অবশ্য বিয়ের পরে স্ত্রীরা চিরকালই প্রধান হয়ে ওঠেন। স্বামী বেচারারা তো তখন আজ্ঞাবহ মাত্র।

—ইস্! তীর্যক চোখে সব্যসাচীর দিকে তাকায় সবিতা।

সব্যসাচী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সজল মিত্রর কথা তুলতেই সবিতা হাসতে হাসতে বললে, সেই লজ্জাতেই লোকটা শেষপর্যন্ত চাকরিতে রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেল।

সব্যসাচী কিন্তু সেই মুহূর্তে সবিতার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারে না। বৌভাতের দিন রবাহুত সজল মিত্রর গল্প, হাসি, ঠাট্টার মধ্যে যে করুণ সুরের মূর্ছনাটুকু তার কানে ধরা পড়েছিল, সেটুকু যেন সর্বদাই বাজতে থাকে তার কানের কাছে। সবিতার কথায় ম্লান সুরে সে বললে, বিলেতের ইন্স্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেণ্টের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র সজলদা বরাবরই দারুণ চাপা স্বভাবের। তার মনের কথা টের পেতে আমাদের হিমসিম খেতে হতো।

—তাই বুঝি বিলেতের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র এদেশে এসে এরকম একটা বোকার মত কাজ করে বসলে?

সব্যসাচী সে কথার জবাব না দিয়ে একটু সময় চুপ্ করে থাকে। তারপর একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, তুমি যাই বলো না কেন, নীরব প্রেমের একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো সজলদা।

—নীরব প্রেম না হাতি! তেমনি হালকা সুরে বলতে থাকে সবিতা, আসলে লোকটা এক নম্বরের ভীতু ও কাপুরুষ। তাই তো একটা নিরপরাধ মেয়ের নামে কলঙ্ক রটাতে তার একটুও বাধে নি। ওকে আমি কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবো না।

সব্যসাচী কোন জবাব দেয় না। সবিতার পক্ষে সজল মিত্রকে ক্ষমা করতে না পারার আসল কারণটা যে কি, তা' যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তা' কি সজলদার ঐ কলঙ্ক রটানোর কাপুরুষতার জন্যে, নাকি নীরব প্রেমের ভীরুতার জন্যে?

সমাপ্ত